গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ১৬ জুলাই, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কেন্দ্রীয় বাজেট আবারও প্রমাণ করল বিজেপি ও কংগ্রেস সরকার

একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ

এবারের বাজেট নিয়ে জনসাধারণের বিশেষ কৌতূহল ছিল এইজন্য যে, সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস জোট সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে ''জনকল্যাণমুখী বা মানবমুখী সংস্কারের'' যে কথা জোর গলায় বলা হয়েছিল, বাস্তবে বাজেটে তার কতটুকু প্রতিফলন ঘটেছে মানুষ তা দেখতে চাইছিল। বলাবাহুল্য মালিকস্বার্থে রচিত এই বাজেট জনসাধারণকে পুরোপুরি হতাশ করেছে। আসলে এই বাজেটও কথার নানা মারপ্যাঁচের আড়ালে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে রচিত নয়া আর্থিক নীতি ও তথাকথিত সংস্কারের পুরনো ধাঁচেরই একটু নতুন কায়দায় উপস্থাপনা।

এই বাজেট কোথায় ''মানবমুখী'' তা নিয়ে ''গবেষণা'' চলতে পারে, পক্ষে বিপক্ষে গুরুগম্ভীর সমীক্ষা ছাপানো যেতে পারে, সিপিএম সহ শাসক বামপন্থীদের সমর্থনের সিলমোহরও তাতে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে গ্রামগঞ্জ-শহরের গরিব-প্রান্তিক-অসংগঠিত সাধারণ মানুষের স্বার্থ কোথায়, তা মাথা খাটিয়েও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এতে সারা বছর দু'মুঠো অন্ন, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-বাসস্থান, বেঁচে থাকার ন্যূনতম রসদ কোথায় ? ইউ পি এ-র অভিন্ন কর্মসূচিতে দেওয়া ১০০ দিনের কাজের প্রতিশ্রুতিও হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। এজন্য বাজেটে কিছু শুকনো কথা ছাড়া এক পয়সাও ব্যয়বরাদ্দ করা হয়নি। উল্টে সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনায় ৫০৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ কমানো হয়েছে। অন্যদিকে এই বাজেটে যৎপরোনাস্তি উল্লসিত দেশি-বিদেশি শিল্পপতি, উদ্যোগপতি ও বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্স। চিদাম্বরমের এই বাজেটকে তারা আরও একটা 'স্বপ্নের বাজেট' বলে আখ্যায়িত করেছে। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এই বাজেট নিয়ে স্বপ্ন দেখাচ্ছে, আর প্রমাদ গুণছেন গরিব সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ। সেই '৯০ দশকের গোড়ায় কংগ্রেস জমানায় মনমোহন সিং-রা ভারতীয়

চারের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৮ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, পুঁজিবাদী আর্থিক সংস্কার বা বিশ্বায়ন-উদারীকরণ-বেসরকারীকরণ নীতি অনুসরণ করতে দায়বদ্ধ কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের ২০০৪ সালের বাজেট, 'মানবিক মুখ' দেখাবার নামে যত বাগাড়ম্বরই করুক, চরিত্রের দিক দিয়ে পূর্বেকার বাজেটগুলি থেকে কোনভাবেই পৃথক নয়। বাজেটে এমন একটিও কঠোর ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি যার দ্বারা অসাধু শিল্পপতি ও কর্পোরেট মালিকদের ১ লক্ষ কোটি টাকার ওপর অনাদায়ী ঋণ আদায় করা যায়, কোটি কোটি কালো টাকার উদ্ধার সম্ভব হয় এবং কর ফাঁকিদাতাদের ধরা যায়। গ্রামীণ কুলাকশ্রেণীর উপরও কোন কর বসানো হয়নি। গ্রামীণ ক্ষেত্রে তথাকথিত গুরুত্ব দেওয়ার নামে নানা খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণে কিছু হেরফের ঘটানো হয়েছে, যার কোন সুবিধা গরিবরা পাবেনা, পাবে গ্রামীণ বুর্জোয়াশ্রেণী যারাই প্রকৃতপক্ষে ট্রাক্টরের উপর কর হ্রাসে উল্লসিত হয়েছে। একইভাবে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী কর বিলোপের সিদ্ধান্ত জমি বাড়ির বড় বড় ব্যবসাদারদের ও শেয়ারের ফাটকাবাজদেরই পুলকিত করবে। বীমা ও টেলিকমের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে বেসরকারীকরণের গতিকেই বাড়ানো হবে। অথচ, সঞ্চিত অর্থের সুদের উপর নির্ভরশীল অবসরপ্রাপ্ত নাগরিকদের জন্য স্বল্পসঞ্চয়ের সুদের হার বৃদ্ধির দাবিকে এই সরকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে এবং উল্টে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার কমিয়ে দিয়েছে। এককথায় জনমুখী মুখোশ পরা পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী এই বাজেট পুরোপুরি জনবিরোধী এবং বড় বড় কথার আড়ালে মেহনতী জনগণের প্রতি চূড়ান্ত প্রতারণাপূর্ণ।

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অত্যধিক রেলভাড়া কমানো হল না

যাত্রীভাড়া এবং পণ্য মাশুল না বাড়িয়ে, সরকারের কাছে ভরতুকি না চেয়ে, ৮৭৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখিয়ে রেলবাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব। সংবাদপত্র একে জনমুখী বাজেট বলেছে। অনেকেই বলেছেন, কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচিতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রেলবাজেট তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছে সিপিএম। গণশক্তি শিরোনাম করেছে — ''সকলকেই স্বস্তি দিয়ে রেল বাজেট''। যাত্রীভাড়া ও পণ্য মাশুল না বাড়ানোয় সন্তোষ প্রকাশ করে সিপিএম পলিটব্যুরোও রেলবাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে।

রেল বাজেটে যে দিকটি এবার সবচেয়ে প্রশংসিত হয়েছে, তা হল যাত্রীভাড়া ও পণ্য মাশুল না বাড়ানো। এর কারণ হল, মানুষ স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরেই নেয় যে বাজেট হলেই ভাড়া বাড়বে, ভাড়া বাড়ানোই যেন সরকারের কাজ। এটা ধরে নেওয়ার ফলেই এবারে বাজেটে ভাড়া না বাড়ানোটা একটা বিরাট জনমুখী পদক্ষেপ বলে প্রচার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বাস্তব হল, এর আগে বিজেপি জোট সরকারের রেলমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীতীশ কুমারও যাত্রীভাড়া বাড়াননি। কাজেই রেলবাজেটে যাত্রীভাড়া না বাড়ানোটা অভূতপূর্ব কিছু নয়; বিজেপি জোট সরকার করতে পারেনি, এমন ধরনের একটা বিরাট পরিবর্তনও নয়। যাত্রীভাড়া না বাড়ানোই যদি সাফল্যের মাপকাঠি হয়, তবে কি বলা হবে বিজেপি জোট সরকারের বাজেটও এই প্রশ্নে সমভাবেই প্রশংসনীয় ছিল?

এক্ষেত্রে এটাও ভাবা দরকার, রেলের পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি, রেলমন্ত্রী ও রেল-আমলাদের পিছনে শ্বেতহস্তী পোষার মতো খরচ কিছুই না কমিয়ে, যাত্রীভাড়া না বাড়িয়েও যেখানে ৮৭৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে, সেখানে এই সরকার প্রকৃত জনমুখী হলে টাকার সংকুলান করে রেলে এমনিতেই যে অত্যধিক ভাড়া নেওয়া হচ্ছে তা কমানো যেত না কি? ডিজেলের সাম্প্রতিক দরবৃদ্ধির ফলে বাড়তি যে খরচ, তা রেলের সামগ্রিক খরচের হিসাবে নগণ্য। রেল বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভি কে আগরওয়ালের বক্তব্য অনুযায়ী, অন্যান্য যানবাহনের জ্বালানি খরচের তুলনায় রেলের

সাতের পাতায় দেখুন

বাসের মধ্যে শ্লীলতাহানি ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে

৯ জুলাই ঝাড়গ্রাম বন্‌ধ সফল

গত ২৬ জুন ঝাড়গ্রাম শহরের অদূরে গড়শালবনীতে বাসের মধ্যে বাসযাত্রী ভারতীদেবীর শ্লীলতাহানিতে উদ্যত বাসকর্মীদের বাধা দিতে গেলে তাঁর স্বামী সুনীল মাহাতকে গলা কেটে খুন করে দুষ্কৃতীরা চলন্ত বাস থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং তাঁদের শিশুপুত্রকেও বাস থেকে ছুঁড়ে ফেলে। ভারতীদেবী কোনরকমে চলন্ত বাস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং গুরুতর আহত হন।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোন গুরুত্বই দেয়নি। এমনকী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে সুনীলবাবুর মৃত্যুর পরও কোন অজ্ঞাত কারণে পুলিশ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে কোন তৎপরতা না দেখানোয় ২৭ জুন গড়শালবনীর মানুষ পথ অবরোধ করেন। সেই পথ অবরোধে বর্বরভাবে লাঠি চালায় পুলিশ। এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার, সুনীলবাবুর স্ত্রীর সরকারি চাকরি, পুলিশী অত্যাচারে আহতদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ এবং পুলিশি বর্বরতার জন্য দায়ী অফিসারদের শাস্তির দাবিতে মহকুমা ও জেলা স্তরে পুলিশ ও প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ

দুয়ের পাতায় দেখুন

বাবরি মসজিদের 'পতন'

কল্যাণ সিংয়ের নতুন বয়ান

একবার বাবরি মসজিদ ভাঙার দায় খোদ মসজিদটির ঘাড়েই চাপিয়েছিলেন প্রয়াত স্বামী বামদেব। বলেছিলেন — বাবরি মসজিদ কেউ ভাঙেনি, ওটা নিজেই ভেঙে পড়েছে। এর একটি নতুন বয়ান দিয়েছেন কল্যাণ সিং, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় যিনি স্বয়ং ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। এ বিষয়ে তদন্তকারী লিবেরহান কমিশনের কাছে জবানবন্দী দিতে গিয়ে কল্যাণ সিং বলেছেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য দায়ী পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীরা। স্বামী বামদেবের মতোই কল্যাণ সিং-এর এই বক্তব্যেরও বাস্তব ভিত্তি নেই।

কল্যাণ সিং-এর সাম্প্রতিক বয়ানটি যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, দেশসুদ্ধ মানুষের চোখ এড়িয়ে পাকিস্তান সেই সময় ২ লক্ষেরও বেশি আই এস আই-এর চর (একটি ছোটখাট সেনাদল) ভারতবর্ষে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল। শুধু এদেশে ঢুকে পড়াই নয়, এই সমস্ত বিদেশি চররা অবলীলায় রামভক্ত সেজে অযোধ্যা নগরীতে মন্দির দখলও নিয়ে নিতে পেরেছিল। কল্যাণ সিং-এর বক্তব্যের অর্থ আরও দাঁড়ায় যে, পূর্বতন উপপ্রধানমন্ত্রী এল কে আদবানি সহ বিজেপি'র শীর্ষ নেতৃত্ব, যাঁরা সেই

পাঁচের পাতায় দেখুন

ঝড়-বাদল উপেক্ষা করে
কুলতলিতে থানা, বিডিও, বিএলএলআরও অফিসে ডেপুটেশন

দীর্ঘদিন ধরে শাসকদল সিপিএম কুলতলি থানা, বিডিও, বি এল এল আর ও অফিসকে কার্যত তাদের পার্টি অফিসে পরিণত করে রেখেছে। তেভাগা আন্দোলনে জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে বহু লড়াই, বহু রক্তক্ষয়, বহু প্রাণদানের বিনিময়ে বেনাম জমি উদ্ধার করে গরিব মানুষ ভূমিহীনদের মধ্যে যে পাট্টা বিলি করা হয়েছিল, বি এল এল আর ও অফিসকে কুক্ষিগত করে ভূমিহীনদের প্রাপ্ত সেই পাট্টা বাতিল করে শাসকদল তাদের কিছু তাঁবে-দারকে এই জমি-জায়গা পাইয়ে দিচ্ছে।

এলাকার উন্নয়নের নামে তারা সাহারা কোম্পানীর কাছে সুন্দরবনকে বিক্রি করে হাজার হাজার সাধারণ পাট্টাদারদের জমি ও বাস্তু থেকে উচ্ছেদ করা এবং গরিবের চিরন্তন অধিকার মাছ-কাঁকড়া ধরা ও মধু সংগ্রহ বন্ধ করতে চাইছে। এছাড়া রয়েছে রেশন কার্ড না পাওয়ার সমস্যা, নদী বাঁধের সমস্যা, প্রকৃত গরিবদের নাম বিপিএল তালিকায় না ওঠার সমস্যা। এসব সমস্যার সমাধানের দাবিতে এস ইউ সি আই কুলতলি ব্লক কমিটি গত ৫ জুলাই কুলতলি বিডিও, বিএলএলআরও অফিস এবং থানায় ডেপুটেশনের ডাক দেয়।

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তিন দিন অবিরাম ঝড়-বৃষ্টি এবং ডেপুটেশনে আসার সময়ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কুলতলি থানার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৩ হাজার গরিব, সাধারণ মানুষ, পাট্টাদার, বর্গাদার ডেপুটেশনে যোগ দেন। এই ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন কুলতলির বিধায়ক ও এস ইউ সি আই দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রবোধ পুরকাইত, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, কমরেড গোবিন্দ হালদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডেপুটেশন যখন চলছিল তখন উপস্থিত জনতার মেজাজ, কমরেডদের বক্তব্য, উদ্দীপ্ত স্লোগান বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল পার্টির সেই সংগ্রামী ইতিহাসকে, স্মরণ করাচ্ছিল সেই নোনা মাটিকে, যে মাটিতে শহীদ কমরেড আমির আলি হালদারের মত নেতা, শহীদ অশোক হালদারের মত যুব কর্মী সহ বহু শহীদের রক্ত মিশে রয়েছে।

ডেপুটেশনের আওয়াজ গোটা এলাকায় এমনভাবে উঠেছিল বলেই পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ক্যানিং-এর সি-আই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও ডেপুটেশন গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, পুলিশ-প্রশাসন যাতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে তা তিনি দেখবেন এবং চাষের মরশুমে পাট্টাদার-বর্গাদারদের চাষ সংক্রান্ত সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবেন। বি এল এল আর ও প্রতিশ্রুতি দেন যে, সমস্ত পাট্টাদারদের পাট্টা রেকর্ড করার কাজ তিনি দ্রুত শুরু করবেন। বিডিও সমস্ত দাবির সাথে সহমত পোষণ করেন এবং বলেন, এই দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন এবং রেশন কার্ড নিয়ে খাদ্য দপ্তর যে দুর্নীতি করছে তা বন্ধ করার এবং রেশন কার্ডের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। সমবেত গরিব জনসাধারণ এলাকায় গণকমিটি গঠন করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করেন।

ঝাড়গ্রাম বন্‌ধ সফল

একের পাতার পর

ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৩ জুলাই ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচ মাথার মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এস ইউ সি আই-এর ঝাড়গ্রাম ইউনিটের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, ৬ জুলাইয়ের মধ্যে দুষ্কৃতীরা সকলে গ্রেপ্তার না হলে ঝাড়গ্রাম মহকুমা বন্‌ধ সহ বৃহত্তর জঙ্গি আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হবে। অবস্থান মঞ্চ থেকে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের কাছে দলমতনির্বিশেষে গণকমিটি গঠন করে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। ৭ জুলাই শহরের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের আহ্বানে ডি এম হলে গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পুলিশ ৭ তারিখ পর্যন্ত (ঘটনার পর ১২ দিন) দুষ্কৃতীদের মধ্যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া বিশেষ কিছুই করেনি।

কনভেনশনের মঞ্চ থেকে ৯ জুলাই ঝাড়গ্রাম মহকুমা বন্‌ধ ডাকা হয়। এবং দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের জন্য গঠিত হয় 'ঝাড়গ্রাম মহকুমা সামাজিক সুরক্ষা কমিটি'।

৯ জুলাই মহকুমার বেলপাহাড়ী থেকে শুরু করে শিলদা, বিনপুর, দহিজুড়ি, ঝাড়গ্রাম, শালবনী, লোধাশুলি সহ সমস্ত মহকুমায় বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক।

কমিটির সভাপতি মনীন্দ্রনাথ মাহাত এবং সুকুমার গিরি বন্‌ধ সফল করার জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

কোচবিহারে সেভ এডুকেশন কনভেনশন

৪ জুলাই কোচবিহার শহরে সেভ এডুকেশন কমিটি আয়োজিত শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় রেডক্রশ ভবনে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষাসংকোচন নীতি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন, ভর্তির ফর্মের দামবৃদ্ধি ও যৌন শিক্ষা চালু করার প্রতিবাদে এবং সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগের দাবিতে কনভেনশনের শুরুতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন মমতা সরকার। প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক শিক্ষক কাজল চক্রবর্তী, মাধ্যমিক শিক্ষক পরিমল চক্রবর্তী, কমিটির সম্পাদক বাণীকান্ত ভট্টাচার্য। কনভেনশনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অজিত রায়। কনভেনশনে সকল বক্তাই শিক্ষার উপর আক্রমণের তীব্র বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন এবং সরকারের জনস্বার্থবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভা পরিচালনা করেন সাধনা বোস। এই কনভেনশনে দুই শতাধিক ছাত্র-অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। উত্থাপিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তুফানগঞ্জে বিভিন্ন দাবিতে মিছিল

১ জুলাই এস ইউ সি আই তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ও বাসভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়া দেওচড়াই অঞ্চলের সিপিএম-এর যুব সংগঠনের আঞ্চলিক সম্পাদক ও স্থানীয় বিধায়ক তমসের আলির ভগ্নিপতি জহির ব্যাপারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং মারুগঞ্জ-দেওচড়াইয়ে সিপিএম-এর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে শতাধিক মানুষের মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ বর্মন। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ দেবেন্দ্রনাথ বর্মন, আছরউদ্দিন আহমেদ, সান্ত্বনা দত্ত।

কোর্টে বিক্ষোভ ঃ ৮ই জুলাই ধৃত জহির ব্যাপারীকে তুফানগঞ্জ আদালতে তোলা হলে তার জামিন না মঞ্জুর করার দাবি জানিয়ে ডি এস ও এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান।

নারীহত্যা ও অপহরণের প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় এম এস এস-এর বিক্ষোভ

বাঁকুড়ায় পর পর কয়েকজন মহিলা খুন এবং জনৈক মহিলার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ২৩ জুন শহরের মূল রাস্তা অবরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু

তারপরও এ বিষয়ে প্রশাসনের চরম উদাসীনতার প্রতিবাদে গত ৬ জুলাই মহিলারা এক বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হন। শতাধিক মহিলা মিছিল সহকারে জেলা শাসকের অফিসের সামনে আসামাত্রই পুলিশ তাঁদের পথরোধ করে। পুলিশের ধাক্কাধাক্কিতে কয়েকজন মহিলার আঘাত লাগে। এই অবস্থাতেই মহিলাদের পক্ষ থেকে স্লোগান বক্তৃতা চলতে থাকে। পরে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আলোচনার আমন্ত্রণ এলে ৫ জন প্রতিনিধি আলোচনায় বসেন। ডিএম-এর অনুপস্থিতিতে এডিএম কথা বলেন এবং ১০ দিনের মধ্যে দাবিগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

পুরকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে আগরতলায় বিক্ষোভ

ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা পুর পরিষদ ২০০৪-০৫ অর্থবর্ষের বাজেট ঘাটতি পূরণ করার জন্য নতুন করে কর বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভেন্ডার, হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর নতুন কর আরোপিত হতে চলেছে। জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মোট মূল্যের ১ শতাংশ কর, হোটেলে বিবাহ কর, পার্কিং জোনে গাড়ি-সাইকেল রাখার জন্য কর ধার্য হতে চলেছে। এরই প্রতিবাদে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে ২ জুলাই পুর পরিষদের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয় এবং পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে করবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানানো হয়। এছাড়া মশা নির্মূলকরণ, আবর্জনা ও ড্রেন পরিষ্কার, পরিশোধিত পানীয় জল সহ অন্যান্য পরিষেবা যথোপযুক্ত করা এবং সম্প্রসারিত পুর এলাকাতেও তার বন্দোবস্ত করার দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ শিবানী দাস, সুব্রত চক্রবর্তী ও অজিত দাস।

বহরমপুর সদর হাসপাতালে বিক্ষোভ অবস্থান

বহরমপুরে জেলা সদর হাসপাতালের সামনে ১ জুলাই এস ইউ সি আই দলের আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে অবস্থান ও বিক্ষোভের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, ঐদিন থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশে জেলার সমস্ত হাসপাতালে রোগীদের কাছ থেকে পথ্যের চার্জ নেওয়া শুরু হয়। এই নির্দেশ অত্যন্ত গোপনে জারী করা হয়, যাতে কোন প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে না ওঠে। রোগীদের আত্মীয়-স্বজনরাও এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হন। অবস্থান চলাকালীন এক প্রতিনিধিদল হাসপাতাল সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেন। দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে সুপার নিজেই বলেন, ১ জুলাই থেকে হাসপাতালের গাড়ি তুলে নেওয়া হয়েছে, ডাক্তারবাবুদের জন্য কলবুকের গাড়ি নেই, দুটি গাড়ির পূর্ণ সময়ের ড্রাইভার নেই, হাসপাতাল পরিষ্কারের জন্য নিযুক্ত ঠিকা শ্রমিকদের তুলে নেওয়া হচ্ছে, ফলে আবার আবর্জনা জমবে, সি এম ও এইচ সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে হাসপাতালেই ইসিজি-র ব্যবস্থা, ডাক্তারদের নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটি, জীবনদায়ী ওষুধের নিয়মিত সরবরাহ ও আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের জন্য ওয়ার্ড চালুর দাবিও জানানো হয়।

শুধু জমি বন্টনের দ্বারা

চাষী জীবনের সমস্যার সমাধান হবেনা

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের লাগাতার আক্রমণে চাষী ও গ্রামীণ মজুর, কারখানা ও চা-বাগিচা শ্রমিক, নিম্নবিত্ত ও আদিবাসী মানুষের জীবন আজ গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত। বিগত দেড় বছরে উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানগুলিতে অনাহারে-অপুষ্টিতে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর সংখ্যা ইতিমধ্যেই এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। মেদিনীপুরের আমলাশোলে কিছুদিন আগে পাঁচজন দরিদ্র আদিবাসী মানুষের না খেতে পেয়ে মারা যাওয়ার খবর সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ও শহরে সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন ক্রমেই তীব্র রূপ নিচ্ছে।

কংগ্রেসের ৩০ বছর এবং বামফ্রন্টের ২৭ বছরের শাসনে কেন রাজ্য থেকে অনাহারের পরিস্থিতি দূর হল না? কেন রাজ্যের সর্বত্র প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন খেতমজুর, কলকারখানার ছাঁটাই শ্রমিক, বন্ধ বাগিচা শ্রমিককে অনাহার-অর্ধাহারের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে? কারণ, এদের নিশ্চিত আয়ের কোন পথ নেই, সুনির্দিষ্ট কাজ নেই। গ্রামে চাষের দু'তিন মাস সময় বাদ দিলে গ্রামীণ গরিব চাষী খেতমজুরদের বাকি বেশিরভাগ সময় কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। সরকারি উদ্যোগে কাজ সৃষ্টি খুবই অপ্রতুল।

অন্যদিকে যারা মধ্যচাষী, যারা মহাজনদের থেকে বা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ফসল ফলান, ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে তাঁরাও ঋণের জালে জড়িয়ে ক্রমাগত জমি হারাচ্ছেন। চাষ ভিন্ন অন্য রোজগারের ব্যবস্থা যাদের নেই তারা এইভাবে ক্রমাগত জমি হারিয়ে গরিব চাষী অথবা খেতমজুরে পরিণত হচ্ছেন। ঋণের বোঝা থেকে অব্যাহতি পেতে অনেক আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। রাজ্য সরকারের প্রচারে যারা বিকল্প হিসাবে সূর্যমুখী, বাদাম প্রভৃতি ফসল আবাদ করেছিলেন, তারাও ত্রুটিপূর্ণ বীজ সহ আনুষঙ্গিক কারণে ফসলে মার খেয়েছেন, সূর্যমুখী খেতে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ জানিয়েছেন।

ফলে স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ৫৭ বছরেও শহরের বিপুল সংখ্যক বেকারের পাশাপাশি গ্রামের গরিব চাষী খেতমজুরদের সারা বছর কাজ এবং ন্যায্য মজুরির কোন সুরাহা হয়নি। চাষীর ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ারও কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার দাবি করে, পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের উন্নয়নের জোয়ার বইছে। তাদের এই দাবি কি রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে? সম্প্রতি জনগণনা রিপোর্ট দেখাচ্ছে, রাজ্যে ব্যাপক হারে কৃষিশ্রমিক বেড়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ — এই দশবছরে রাজ্যে কৃষিমজুরের সংখ্যা বেড়েছে ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার। খেতমজুরদের সংখ্যা বাড়ার এই প্রবণতা কি অগ্রগতির লক্ষণ? এই প্রবণতা কোন অবস্থাতেই কৃষকের উন্নতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, গ্রাম বাংলার অগ্রগতি বোঝায় না। বরং এই প্রবণতার অন্তরালে নিহিত রয়েছে এমন এক শোষণপ্রক্রিয়া, যার পরিণতিতে মধ্যচাষী প্রান্তিক চাষীতে এবং প্রান্তিক চাষী ভূমিহীন খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে এই ধারাই অব্যাহত ছিল, বামফ্রন্টের ২৭ বছরের শাসনে তা আরও অবনতির দিকে গেছে।

ভূমি সংস্কার করে কৃষকদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে বলে সিপিএম যে প্রচার করে সেটাও বহুলাংশে অতিরঞ্জিত। তাছাড়া সিপিএম ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ করেছে, সেই অনুযায়ী সিপিএম মনে করে, গ্রামে ভূমি সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণের দ্বারাই, অর্থাৎ গরিব চাষীর হাতে জমি বন্টনের দ্বারাই গ্রামীণ সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ সম্পর্কে ষাটের দশকে মূলত দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় যখন ভূমিহীন ও গরিব চাষীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জমি বন্টন হয়েছিল, সেই সময় বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ''শুধু বেনামজমি, খাসজমি উদ্ধার ও পতিত জমি চাষোপযোগী করে চাষীদের মধ্যে বিলি করলেই চাষীর সব সমস্যার সমাধান হবে না।'' বলেছিলেন, ''প্রথমত, জমি বিলির কর্মসূচি কার্যকরী করার দ্বারা সমস্ত খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী জমি পাবে না। দ্বিতীয়ত, জমি যারা পাবে, তারাও জমি রাখতে পারবে না।'

অর্থাৎ, এই স্বল্প জমি অলাভজনক জোত হওয়ায় তা প্রান্তিক কৃষক ধরে রাখতে পারবে না। বর্তমানে বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, যাঁরা জমি পেয়েছিলেন, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মে সেই জমি তাঁরা সম্পন্ন চাষীদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

ফলে গরিব চাষী ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে শুধু জমি বিলির দ্বারাই গ্রামীণ সমস্যার সমাধান হবেনা। তাহলে কিসে হবে ? এইসব দিক ব্যাখ্যা করেই কমরেড শিবদাস ঘোষ চাষী আন্দোলন প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন, ''চাষী বাঁচবে না, যদি গ্রামীণ গরিব চাষী পরিবারগুলির প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হয় ... এই কর্মসংস্থানই গ্রামীণ জীবনের মূল সমস্যা।''

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে যারা ক্ষমতাসীন তারা বেকার গ্রামীণ মানুষদের কর্মসংস্থানের জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে? কেন্দ্রের বর্তমান সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকার গ্রামীণ গরিবদের বছরে ১০০ দিনের কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদিও এবারের বাজেটে এই খাতে কোন অর্থই বরাদ্দ করা হয়নি। ফলে ওটা নিছকই প্রতিশ্রুতি। তদুপরি বাদবাকি দিনগুলি গ্রামের গরিব মানুষের কাজ পাওয়ার কি হবে এবং তারা কী খেয়ে-পরে বাঁচবে এ নিয়েও তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাছাড়া গ্রামীণ গরিবদের অন্তত এই ১০০ দিন কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রেও সিপিএম যে আপত্তি তুলেছে সে ব্যাপারে গণদাবীর গত সংখ্যাতেই আমরা আলোচনা করেছি। অন্যদিকে রাজ্য সরকার দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের সংখ্যা যত কম করে দেখানো যায় তাই দেখাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ গরিবদের জন্য নানা প্রকল্পে সরকারি বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। যতটুকুও বা বরাদ্দ হচ্ছে সঠিক পরিকল্পনার অভাবে টাকার একটা বিরাট অংশ ফেরৎ চলে যাচ্ছে। ফলে সমস্ত সরকারি প্রকল্প মিলিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা বিরাট অংশের মানুষের কিছু করে খাওয়ার মতো ব্যবস্থা আজও সরকার করে দিতে পারেনি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ৭ বছরে বিভিন্ন মজুরীভিত্তিক প্রকল্পে এ রাজ্যের মাত্র ২ শতাংশ বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষ সারা বছর কাজ পেয়েছে। (বর্তমান ৩০-৬-০৪)

বামফ্রন্ট সরকার খুব ঘটা করে বলছে, গ্রামে গ্রামে 'সেল্ফ হেল্প গ্রুপ' গড়ে তুলে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা বা এস জি এস ওয়াই অনুযায়ী বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ১৫ থেকে ২০ জন যুবকযুবতীদের নিয়ে এক একটা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেরা প্রথমে কিছু টাকা জোগাড় করবে। নিজেরা যত টাকা জোগাড় করবে সরকারও তত টাকা দেবে। এইভাবে যে ফান্ড হবে, সেই পুঁজি নিয়ে গোষ্ঠীগুলি গ্রামীণ এলাকায় হাঁস-মুরগি পালন, বেতের ঝুড়ি বোনা, মাদুর বোনা, পঞ্চায়েতের পতিত জমিতে শাক-সবজি চাষ, ফলের চাষ, মাসরুম চাষ, পঞ্চায়েতের দখলে থাকা পুকুর বা জলাশয়ে মাছ চাষ প্রভৃতি ছোট ছোট উদ্যোগ নিয়ে রোজগারের পরিকল্পনা করলে ব্যাঙ্ক ঋণ দেবে। তারই ভিত্তিতে প্রকল্পগুলি দাঁড় করিয়ে বেকাররা স্ব-নির্ভর হবে এবং সরকারের কাছে তখন আর চাকরির দাবি করতে হবেনা। এভাবেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বেকার যুবকদের হতাশায় না ভুগে ঘুরে দাঁড়াবার ব্যবস্থা নাকি করে দিচ্ছে।

কিন্তু বাস্তবে এই প্রকল্পগুলি কি দাঁড়াচ্ছে? স্ব-নির্ভর হচ্ছে? সম্প্রতি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সচিব মানবেন্দ্র রায় প্রত্যেক জেলার সভাধিপতি ও জেলাশাসকদের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে যে চিঠি দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, ''২০০৩-২০০৪ সালের প্রথম দিকে রাজ্যে মোট ৫৮ হাজার ৭৫২টি স্ব-নির্ভর দল ছিল। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে গ্রেড ওয়ান পাশ করা দলের সংখ্যা ৪০ হাজার ৩৭টি। অর্থাৎ বাকি ১৮ হাজার দল গঠিত হলেও তারা কোন গ্রেডেশন পায়নি।'' (বর্তমান ১০-৬-০৪) ব্যাঙ্ক সহযোগিতা করেনি। এই সমস্ত প্রকল্পগুলির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এভাবে যে কর্মসংস্থান বাস্তবে হতে পারেনা, সোজা কথায় এটা যে গ্রামীণ বেকার যুবকদের স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের মতই একটা ধোঁকা দেওয়ার প্রকল্প এবং বেকার যুবকদের গ্রামের মধ্যেই একটা কিছু প্রকল্পের নাম করে আটকে রাখারই কৌশল, তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রকল্পে ব্যাঙ্ক কেন সহযোগিতা করছে না? শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেন, ''ব্যাঙ্কগুলি মারুতি কেনার জন্য, ব্যবসা করার জন্য ঋণ দিতে চাইছে। কিন্তু উৎপাদনমুখী ছোট শিল্প গড়ার জন্য ঋণ দিতে চাইছে না। কিছুদিন ঘুরিয়ে বলে দিচ্ছে, কারখানা লাভজনক হবে না, তাই ঋণ দেওয়া যাবে না।'' (বর্তমান ২১-৬-০৪) এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যদি সত্যিই সিরিয়াস হত, তাহলে ব্যাঙ্কের অসহযোগিতা দূর করার জন্য উদ্যোগী হত। তাদের সে উদ্যোগ কোথায়?

ফলে ভূমিহীন খেতমজুর ও প্রান্তিক চাষী, যারা অন্যের জমিতে জনমজুরী খাটেন এবং যে কাজ সারা বছর থাকে না — তাদের কাজের ব্যবস্থা আজও সরকার করে দিতে পারেনি। তাহলে গ্রামে কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ কীভাবে সৃষ্টি করা যাবে? এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক শিল্পায়নের দরজা খুলে দেওয়া, শিল্পে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই কাজটি করার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, যার অবসানের সঙ্গে সমস্ত মানুষের কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি জড়িত।

খেতমজুর ও প্রান্তিক চাষী ছাড়াও গ্রামে আরেকটা অংশ রয়েছে — তাদের বলে মধ্যচাষী। এদের অবস্থাটা কী? বর্তমানে চাষের খরচ ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বীজের দাম, সারের দাম, কীটনাশকের দাম অত্যধিক বেড়েছে। পেট্রল-ডিজেল-বিদ্যুতের দাম বাড়ায় সেচের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষির জন্য বীজ এখন আর কৃষকের হাতে থাকছে না। বীজের ব্যবসা ক্রমশ বেশি বেশি করে বহুজাতিকদের হাতে চলে যাচ্ছে। ইউ এস এগ্রিসীডস কোম্পানি শসা বীজ বিক্রি করছে ১৫,৫০০ টাকা কেজি দরে, ফুলকপির বীজ ২৮ হাজার টাকা কেজি দরে ও উচ্ছে বীজ ২৫ হাজার টাকা কেজি দরে। হাইব্রীড টমেটোর এক কেজি বীজের দাম নিচ্ছে তারা ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। এত বেশি দামের বীজ ব্যবহার করেও উত্তরবঙ্গের তরাইয়ের কৃষকরা মার খেয়েছেন। বীজ লাগানোর পর দেখা গেছে ঠিকমত বীজের অঙ্কুরোদগম হয়নি। এর হাত থেকে চাষীকে রক্ষা করতে সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। বীজ থেকে শুরু করে চাষের যাবতীয় উপকরণ আজ বহুজাতিকদের দখলে। তারা ইচ্ছামত দাম বাড়িয়ে কৃষককে বেশি দামে কিনতে বাধ্য করছে।

হলদিবাড়ির টমাটোর মার্কেট বিখ্যাত। এই বাজারে চাষী যখন ১০ পয়সা কেজি দরে টমাটো বিক্রি করেন, তখন কলকাতার বাজারে টমাটো ৫/৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। কাঁচা সবজি সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা আজও সরকার গড়ে তোলে নি। ফলে পাইকাররা-আড়তদাররা যে দাম দেয়, চাষীকে সেই দামে বাধ্য হয়ে বিক্রি করে দিতে হয়। অবস্থা এমনও হয় যে, বাজারে মাল নিয়ে যাওয়ার খরচটুকু মাল বিক্রি করে পাওয়া যায় না।

ফলে চাষীর সামনে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার সমস্যা। ন্যায্য দামে চাষীর কাছ থেকে ফসল কেনার সরাসরি সরকারি কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে আড়তদার-মজুতদার-ব্যবসায়ীরা চাষীকে ঠকিয়ে কম দামে ফসল কিনে নেয়। অভাবের কারণে চাষীর ফসল বিক্রি না করে উপায় থাকে না। তারপর সেই ফসলের দাম যথেচ্ছ বাড়িয়ে ব্যবসায়ীরা বাজারে ছাড়ে। সাধারণ মানুষকে সেই বর্ধিত দামেই তা কিনতে হয়। কারণ ন্যায্য দামে তা কেনার সরকারি কোন ব্যবস্থাও নেই।

সরকারি উদ্যোগে পাট কেনার যে ব্যবস্থা জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার (জেসিআই) মাধ্যমে কিছুটা হলেও ছিল, তাকেও তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এ বছর জানুয়ারি মাসে যখন বিজেপি সরকার কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল, কেন্দ্রীয় বস্ত্র-মন্ত্রকের যুগ্মসচিব অতুল চতুর্বেদী পাট কমিশনার শুভকীর্তি মজুমদারকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন, পাট ও পাটজাতদ্রব্য আর অত্যাবশ্যক পণ্য তালিকায় থাকছে না। আর তা না থাকলে পাটের দামের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ যতটুকু আছে তাও লোপ পাবে। ''গত ২ জুলাই '০৪ (সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকারের) কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে, জুট কর্পোরেশনের মাধ্যমে চাষীদের থেকে পাট কেনার জন্য কোনও অনুমোদন দেওয়া হবেনা।'' (বর্তমান ৬-৭-০৪) ফলে জেসিআই বাজারে পাট কিনতে আসবেনা। এতে সুবিধা হবে চটকল মালিকদের। তারা নিজেদের ইচ্ছানুসারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের দাম ঠিক করতে পারবে। ফলে

ছয়ের পাতার দেখুন

একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

একের পাতার পর

উচ্চাকাঙ্ক্ষী একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে ডব্লু টি ও এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির নির্দেশ ও সহায়তায় বিশ্বায়ন-বেসরকারীকরণ ও সংস্কারের কর্মসূচি তৈরি করেছিল, পরবর্তী বিজেপি সরকার সহ অন্যান্য সরকারগুলিও যা বজায় রেখেছিল, এককথায় এবারও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। দেশিবিদেশি একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থকেই এই বাজেট পুরোপুরি সুরক্ষিত করেছে।

ন্যূনতম কর্মসূচি বা সিএমপি ঘোষণার সময় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কৃষিতে 'নিউ ডিল'-এর কথা বলেছিলেন। সেই মতো নাকি এবারের বাজেটে কৃষির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অথচ গতবার গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের বরাদ্দ ছিল ১৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা। তা কমিয়ে এবার করা হয়েছে ১৫ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা। এভাবে ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা কমিয়ে দেবার পর সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকার কি করে কৃষিজীবী ও গ্রামীণ গরিবদের স্বার্থ দেখার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে — তা পাটিগণিতের হিসাবে ঠিক বোঝা গেল না। বাজেটে বড় বড় ট্রাক্টরের দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আগামী তিন বছরে কৃষিঋণ দ্বিগুণ করা, কম সুদে কৃষি-ঋণ দেওয়া, কৃষি বিমা চালু করা, কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলিতে কর ছাড় দেওয়ার কথা বাজেটে বলা হয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে অর্থমন্ত্রী দেখাতে চাইছেন, যেন তিনি 'গ্রামের মানুষের' মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। অথচ এইসব ঘোষণার সঙ্গে সাধারণ খেটেখাওয়া চাষির কোন সম্পর্ক নেই। কারণ কৃষিতে অঢেল পুঁজি ঢেলে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা উৎপাদন এবং প্রসেসিং ও মার্কেটিং-এর উপর যে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও কব্জা কায়েম করেছে, তার সঙ্গে গ্রামীণ সাধারণ চাষি কখনই এঁটে উঠতে পারেনা। কম সুদে কৃষি ঋণ, কৃষি বীমা, কৃষিভিত্তিক শিল্প সবকিছুই গ্রামের সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাঁদের মধ্যে দু'পাঁচজন যতটুকু সামান্য ঋণ ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে চাষ-আবাদ করেন, ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ফসল অভাবী বিক্রি করে শেষপর্যন্ত দেনার দায়ে তাঁরা সর্বস্বান্ত হন। তাঁদের অনেককেই বাধ্য হয়ে আত্মহননের পথকেই বেছে নিতে হয়। এইভাবে বিগত কয়েক বছরে সারা দেশে কয়েক হাজার চাষী সরকারের নির্মম সংস্কার যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

গ্রামীণ গরিব মানুষ আজ কোন্ অবস্থায় প্রাণটুকু ধরে রেখেছেন বা অনাহারে মরছেন, আমলাশোলের ঘটনা তার একটি নমুনা মাত্র। এই পশ্চিমবঙ্গেই সিপিএম কেন্দ্রের নয়া আর্থিক নীতি রূপায়ণের অঙ্গ হিসাবে বিকল্প চাষের ফরমান দিচ্ছে। প্রথাগত ধান চাষী, আলু চাষী তো ফসলের দাম পাচ্ছেনই না, বিকল্প চাষের ফাঁদে পড়ে বাদাম বা সূর্যমুখী যাঁরা চাষ করেছেন তাঁরাও দাম পাচ্ছেননা। কৃষিতে লগ্নীবৃদ্ধির সরকারি সিদ্ধান্ত থেকে লাভবান হবে তাঁরাই যাঁদের ঋণের জন্য বন্ধক রাখার মতো যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, পুঁজি খাটাবার মতো জমি আছে। অর্থাৎ এ থেকে ফায়দা লুঠবে ভারতীয় বৃহৎ কৃষি-পুঁজিপতিরা এবং মনসান্টো বা কার্গিলের মতো বৃহৎ অ্যাগ্রো-মাল্টিন্যাশানালরা। গরিব চাষী ঋণ নিয়ে কৃষিতে লগ্নি করতে পারে না, উপযুক্ত পরিমাণ জমি ও বন্ধকযোগ্য সম্পত্তির অভাবে। তাদের আজও উচ্চহারে সুদে মহাজনের কাছে কর্জ নিতে হয়। গরিব চাষীর আজ প্রধান সমস্যা মরশুমে ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া, খেতমজুরের সমস্যা ন্যায্য মজুরি ও সারা বছর কাজ পাওয়া। বাজেটে এই দুই সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি।

অন্যদিকে বাজেটে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় যাঁদের তাঁদের আয়কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, ভাবখানা যেন বিরাট জনদরদী কিছু করা হল। সংবাদে প্রকাশ, করের আওতার বাইরে গিয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু কতজন এই ছাড় থেকে উপকৃত হবেন ? একশো দু'কোটি মানুষের দেশে মাত্র ১ কোটি ৪০ লক্ষ জন। দেড় শতাংশেরও কম।

বিগত বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একটা বড় ক্ষোভ জনগণের ছিল এজন্য যে, মালিকশ্রেণীকে সস্তায় মূলধন যোগানো ও সরকারের নিজের সুদের ভার লাঘব করার জন্য তারা মেয়াদী আমানতে সুদ এত কমিয়ে দিয়েছে যে, সুদনির্ভর প্রবীণ মানুষদের বেঁচে থাকাটাই মুশকিল হয়েছে। সাধারণ মানুষের দাবি ছিল, প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদ কমানো তো চলবেই না, বরং বাড়াতে হবে এবং স্বল্পসঞ্চয়ে বেশি সুদ দিতে হবে। নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সিপিএমের প্রধান প্রচারটা ছিল স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ কমানোর। অথচ সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস জোট সরকার প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ কমিয়ে ৮ শতাংশ করেছে এবং প্রবীণ নাগরিকদের বেশি সুদ দেবে বলে নির্লজ্জ প্রতারণা করেছে। বাজেটে বলা হয়েছে, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ জমাপ্রকল্পে ৯ শতাংশ সুদ দেওয়া হবে। এখন জানা যাচ্ছে, এটি ব্যাঙ্ক আমানত বা ওই ধরনের জমা প্রকল্প নয়। ওই সুদ দেওয়া হবে একটি প্রচলিত সরকারি ঋণপত্রে। তাও আবার টাকা রাখলে দু'বছরের মধ্যে তা তোলা যাবে না। ঋণপত্র বাজারে ছাড়াটা সরকারের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই সর্বদা চাইলেই ঐ ঋণপত্র (কিষাণ বিকাশপত্র বা এন এস সি'র মতো) বাজারে পাওয়া যাবে — এরও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রবীণদের জন্য বাড়তি সুদের ব্যবস্থাও নেহাতই ঠকবাজি।

বাজেটে একইসঙ্গে সবরকম আয়কর, পুরকর, এক্সাইজ ও কাস্টমস ডিউটি ও পরিষেবা করের ওপর সারচার্জের মতো ২% হারে শিক্ষা সেস বসানো হয়েছে। এই ২% সেস বসিয়ে চলতি আর্থিক বছরে ৭ মাসে ৪-৫ হাজার কোটি টাকা আদায় হবে। কিন্তু যার জন্য এই সেস্ বসানো হয়েছে, সেই শিক্ষায় বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ৬০০ কোটি টাকা। বোঝাই যায়, বাদবাকি টাকা অন্যখাতে ব্যয় করা হবে, যা সরকার সন্দেহজনকভাবে গোপন করেছে। শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী দু'রকম মূলধনী লাভের ওপর ধার্য কর যথাক্রমে তুলে দেওয়া ও কমানো হয়েছে। বিপরীতে শেয়ার কেনাবেচার (টার্নওভার) ওপর ০.১৫% হারে যে কর দিতে হবে, তা শেয়ারের ক্রেতাকেই দিতে হবে। ফলে শেয়ারবাজারে একটা অংশের শেয়ার ব্রোকারদের মধ্যে প্রাথমিক একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলেও ট্যাক্স দিয়ে সরকারি অনুমোদনেই শেয়ারে ঢালাও ফাটকার লেনদেন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ও বিপদ বাড়বে, এবং এতে ফাটকাবাজরা লাভবান হবে এজন্য যে স্বল্পমেয়াদী মূলধনী লাভে কর কমায় দ্রুত শেয়ার বেচাকেনা বাড়বে, যা ফাটকা বাজারকেই পুষ্ট করবে।

সিপিএম সমর্থিত সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকার মুখে বিলগ্নীকরণ মন্ত্রক তুলে দিলেও এই পথেই চার হাজার কোটি টাকা আয়ের ব্যবস্থা বাজেটে করা হয়েছে। বাজেট ভাষণেও অর্থমন্ত্রী কবুল করেছেন, বিলগ্নীকরণ বন্ধ হচ্ছে না। কোন্ কোন্ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণ করা ছাড়া উপায় নেই, সেটা খতিয়ে দেখার জন্য একটি নতুন বোর্ড গঠন করা হবে। ১৯৯৬-৯৭ সালে কংগ্রেস ও সিপিএম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম-ই একটি বিলগ্নীকরণ কমিশন গঠন করেছিলেন। এবারের বাজেটে সেই চেনা পথ ধরে নতুন নামে বিলগ্নীকরণ কমিশনকেই প্রকারান্তরে ফিরিয়ে আনলেন। বিগত বিজেপি'র এন ডি এ সরকার যা পারেনি, সিপিএমের সমর্থনে এই ইউপিএ সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে খুবই লাভজনক সংস্থাগুলোর মধ্যে বীমাশিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ২৬% থেকে বাড়িয়ে ৪৯% করেছে, টেলি যোগাযোগ শিল্পে ৪৯% থেকে বাড়িয়ে ৭৮%, বিমান চলাচল শিল্পে ৪০% থেকে বাড়িয়ে ৪৯% করেছে। এমনকি 'নবরত্ন' সংস্থা ন্যাশানাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশনের (NTPC) ৫% শতাংশ শেয়ার বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে সরকার। এবারের বাজেটে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ টেনে আনার জন্য নতুন বিনিয়োগ কমিশন গঠন করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

এবারের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৬৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এবার বাড়িয়ে তা করা হয়েছে ৭৭ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিরক্ষা খাতে ২৭% বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিপুল অঙ্কের ব্যয়বরাদ্দের কতটা আদৌ প্রয়োজন তা নিয়ে যুক্তিসংগত কথা বলতে গেলে দেশদ্রোহী বলে মার্কা দেওয়া হবে। দেশের মানুষের নিরাপত্তা আর প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দকে এক করে দেখিয়ে একটা অতিকথা (মিথ) তৈরি করা হয়েছে, যেন এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবেনা। আসলে, যে বাজার অর্থনীতির ভক্তজনেরা অভীষ্ট বাজারের জয়গানে সর্বদা দিক্‌বিদিক বিদীর্ণ করছে তাদের সেই, 'সবার উপরে সত্য', বাজার যখন আর মাথা খুঁড়ে বিন্দুমাত্রও প্রসারিত করা যাচ্ছে না, শিল্পে নতুন লগ্নী করা যাচ্ছে না, চলতি শিল্প-কারখানা বন্ধ হচ্ছে, অবিক্রিত মাল বাজারে জমছে, বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ছে, পুঁজি অলস হয়ে পড়ছে, এই অবস্থায় কৃত্রিমভাবে বাজারকে চাঙ্গা রাখতে কী উন্নত, কী অনুন্নত সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াচ্ছে। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় জিনিসের অর্ডার দিয়ে অর্থনীতি সচল রাখতে চাইছে। সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদানির্ভর অর্থনীতির উপর প্রতিরক্ষার চাহিদা নির্ভর করেনা। জনগণের তহবিল খরচ করে এখানে সরকার নিজেই অর্ডার দেয়, নিজেই কেনে। কর-দর-ঋণভারে ন্যুব্জ জনসাধারণের টাকায় সরকার সৈন্যবাহিনীর বাসস্থান-পোষাক-খাদ্য থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচ বহন করে, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ তৈরি করে। আর 'দেশ বিপন্ন', 'দেশ আক্রান্ত হতে পারে', এই সমস্ত ধুয়ো তুলে এবং প্রয়োজনে এমনকি তার জন্য এখানে সেখানে দু-একটা সীমান্ত সংঘর্ষ বাধিয়ে হোক, অথবা নিয়ন্ত্রিত স্থানীয় যুদ্ধ বাধিয়ে হোক, প্রতিরক্ষা মিথ্‌কে প্রবল থেকে প্রবলতরভাবে দেশের মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দেয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এই বিভ্রান্তিকে পুঁজি করেই সরকার বিনাবাধায় এবং বলা ভালো, কি বামপন্থী কি দক্ষিণপন্থী, সকলের সমর্থনে পুঁজিপতিদের স্বার্থকে আড়াল করে দেশের স্বার্থের(!) নামে প্রতিরক্ষা খাতে ক্রমাগত ব্যয়-বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছে। এভাবেই মুমূর্ষু পুঁজিবাদকে তারা অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

কিন্তু মানুষ মরলে তাদের কিছু যায় আসে না। তাই সামরিক বাজেটের বিপুল বৃদ্ধির পাশাপাশি নানা খাতে ভরতুকি বরাদ্দ ৫০ হাজার কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৪৩ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। যাঁরা ভরতুকি কমানোর পক্ষে তাঁরা দুটি অজুহাত মূলত দেখান। তাঁরা বলেন — প্রথমত, ভরতুকির দ্বারা প্রকৃত গরিব উপকৃত হয় না, ভরতুকির সুফল তারা পায় না, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বিত্তবানরাই এর সুফল পায়। দ্বিতীয়ত, ভরতুকি দেওয়ার মতো টাকা সরকারের নেই।

ভরতুকির সুফল প্রকৃত গরিব পায়না, এজন্য ভরতুকি তুলে না দিয়ে সরকারের উচিত এমন ব্যবস্থা করা যাতে প্রকৃত গরিব তা পায়। তা না করে এই অজুহাতে ভরতুকি কমালে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিপিএমের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক চরিত্র পুনরায় উদঘাটিত

২০০৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে সিপিএম পলিটব্যুরো যে অবস্থান নিয়েছে, তার তীব্র সমালোচনা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১২ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেছেন, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের জনবিরোধী ও পুঁজিপতিঘেঁষা চরিত্র অত্যন্ত পরিষ্কার। উদারীকরণ-বিশ্বায়ন-বেসরকারীকরণের যে পুঁজিবাদী আর্থিক সংস্কার দেশের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ধ্বংস করছে, সেই সর্বনাশা নীতিকেই জোরালোভাবে কার্যকরী করার লক্ষ্যে এই বাজেট রচিত হয়েছে। কিছু ভাসাভাসা প্রতিশ্রুতি ছাড়া মেহনতি জনগণকে ন্যূনতম রিলিফ দেওয়ার কোন নির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা এই বাজেটে নেই, যদিও অনুৎপাদক প্রতিরক্ষা খাতে ব্যাপক বরাদ্দবৃদ্ধিতে এই বাজেট অত্যন্ত তৎপরতা দেখিয়েছে।

সিপিএম পুনরায় ঘোষণা করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করার মতো কোন পদক্ষেপ তারা নেবেনা। যার ফলে বাজেটে অর্থনীতির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো ও পি এফে সুদ কমিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করে যে কথা তারা বলেছে, সেটা বাস্তবে জনগণকে প্রতারণা করার জন্য একটা লোকদেখানে বিরোধিতা ছাড়া কিছু নয়। এর দ্বারা সিপিএম চূড়ান্ত জনবিরোধী এই বাজেট নিরাপদে পাশ করিয়ে দেওয়া নিশ্চিত করে দিল এবং তাদের নিঃশর্ত সমর্থনের বিষয়েও কংগ্রেসকে নিশ্চিন্ত করল। এ ঘটনা সিপিএম নেতৃত্বের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক চরিত্রকেই পুনরায় উদঘাটিত করল।

দেশের মেহনতি জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কমরেড মুখার্জী বলেছেন, এইসব মেকি মার্কসবাদীদের দ্বারা জনজীবনের দুর্দশার কোন লাঘব ঘটবে, এরকম কোন মোহ যেন মেহনতি মানুষ পোষণ না করেন, এবং পুঁজিবাদী বাজেটের আক্রমণকে প্রতিহত করতে ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনের পথকেই গ্রহণ করেন।

সুব্রতবাবুর জনমোহিনী পুর বাজেট কিন্তু পুরপরিষেবার কী হবে?

সম্প্রতি কোলকাতা পুরসভার মেয়র ২০০৪-০৫ সালের জন্য ৮৩৩ কোটি টাকার পুরবাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটে মোট ১১৩ কোটি টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে। এবারের পুরবাজেটের বিশেষত্ব হল ঢালাও কর ছাড়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী বছর পুরভোটের সামনে দাঁড়িয়ে নাগরিকদের প্রভাবিত করার জন্যই এই ঢালাও কর ছাড়। বিরোধীরা, মূলত সিপিএম, একে চটকদারি ও ভোটমুখী বাজেট বলে অভিহিত করলেও ভোটাররা রুষ্ট হবে ভেবে এর বিরোধিতা করতে সাহস পায়নি। মেয়র এবং তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য একে ভোটমুখী বাজেট বলতে নারাজ। তাঁরা এই বাজেটকে 'ঐতিহাসিক' এবং 'গণমুখী' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে এর সাথে ভোটের কোনো সম্পর্ক নেই, এই বাজেট জনমুখী এবং বাস্তববাদী। তাঁদের আরও দাবি, এই ঘাটতি বর্ষশেষে থাকবে না, কারণ এবছরও পুরবাজেটে বরাদ্দ ১৫০ কোটি টাকা তাঁরা খরচ করতে পারেননি। এই অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে। দু'পক্ষের তরজার মধ্যে না গিয়ে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে এই বাজেট কতটা জনমুখী এবং বাস্তববাদী।

২০০০ সালের জুন মাসে তৃণমূলের নেতৃত্বে এই পুরবোর্ড গঠিত হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে চার বছর ধরে বিপুল হারে পৌরকর বাড়িয়ে এবছর ভোটের দিকে তাকিয়ে কিছু কর তারা ছাড় দিয়েছে। এ অনেকটা গরু মেরে জুতো দানের মতো ঘটনা। চার বছর ধরে নাগরিকদের গলায় ফাঁস দিয়ে এবারে ফাঁসটা একটু আলগা করে দিয়ে তারা বলছে, 'দেখো, কীরকম স্বস্তি দিলাম।'

২০০০ সালে কলকাতাবাসী পূর্বতন সিপিএম পরিচালিত পুরবোর্ডের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে পুরভোটে জয়ী করে। কিন্তু আজ চার বছর পরে বর্তমান তৃণমূল বোর্ডের কার্যকলাপে কলকাতাবাসী চূড়ান্তভাবে হতাশ। চূড়ান্ত দুর্নীতি ও ঘুষ ঢালাওভাবে চলছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতীতের বোর্ডকেও তারা ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভুক্তভোগীদের অনেকের মতে, যেহেতু এই বোর্ডের পুরপিতা- মাতারা বুঝতে পারছেন, এই পুরবোর্ডের পরমায়ু ৫ বছর, তাই এই ৫ বছরে যতটা পারা যায় লুটেপুটে খাওয়া যাক। শেষ বছরে কিছুটা কর ছাড় দিলেই চলবে। অন্যদিকে পৌরপরিষেবার দিন দিন চরম অবনতি ঘটছে। বহু ওয়ার্ডে প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ বর্তমান পুরপিতাদের চূড়ান্ত অপদার্থতায় সাপ্তাহিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রেও লক্ষ করা যাচ্ছে চূড়ান্ত বৈষম্য। কলকাতা পুরসভার সাবেক ওয়ার্ডগুলি থেকে সংযুক্ত এলাকার ওয়ার্ডগুলি অনেকাংশে বড় হওয়া সত্ত্বেও সাফাই কর্মচারীর সংখ্যা সাবেক এলাকার থেকে অনেক কম। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, সংযুক্ত এলাকার (added area)-র নাগরিকরা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর? অপরদিকে ড্রেন বা খোলা নর্দমা পরিষ্কার বহুক্ষেত্রে মাসিক কর্মসূচিতে পরিণত এবং নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্যত প্রহসনে পরিণত। সেচ দপ্তরের উদাসীনতায় সমস্ত নিকাশি খালগুলি মজে গিয়েছে। অন্যদিকে শহরের নিকাশি ড্রেন বা নর্দমাগুলি ঠিকমত পরিষ্কার হচ্ছে না, ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যাচ্ছে। বহু এলাকাতেই তা নামতে সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে এবং এই নিয়ে চলছে পুরসভা ও সেচদপ্তরের চাপান-উতোরের নোংরা রাজনীতি। এর শিকার হচ্ছেন সাধারণ নাগরিক, বিশেষত সংযুক্ত এলাকার নাগরিকরা। ১৯৮৪ সালে নিছক ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার বেহালা, যাদবপুর ও গার্ডেনরিচ মিউনিসিপ্যাল এলাকাকে কলকাতা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলকাতা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হলেও মহানগরীর ন্যূনতম সুবিধা, যথা — ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশিব্যবস্থা আজও তৈরি হয়নি। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (ADB) প্রোজেক্টের 'খুড়োর কল' সিপিএম পরিচালিত পুরসভাও দেখিয়েছিল, এই বোর্ডও দেখিয়ে গেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পরিকল্পনার অভাব ও প্রোমোটার রাজ। যত্রতত্র পরিকল্পনাবিহীন ভাবে বহুতল বাড়ি তৈরি হয়েছে। বসেছে গভীর নলকূপ। ফলে একদিকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গিয়ে পানীয় জলের সঙ্কট তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে নির্বিচারে পুকুর, খালবিল বুজিয়ে বাড়ি তৈরির ফলে বর্ষার অতিরিক্ত জল ধরে রাখার জায়গা কমে গেছে। সামান্য বৃষ্টিতেই নীচু এলাকাগুলি ভেসে যাচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পাম্পিং স্টেশনগুলির দুরবস্থা। ইংরেজ আমলে তৈরি অধিকাংশ পাম্প উপযুক্ত ও নিয়মিত মেরামতির অভাবে প্রায় অকেজো হয়ে যেতে বসেছে। এর কী করুণ পরিণতি হতে পারে তা আমরা ১৯৯৯ সালের ২৪-২৭ সেপ্টেম্বর একটু বেশি বর্ষণের সময় লক্ষ করেছি। পূর্বতন সিপিএম চালিত পুরবোর্ড ও বর্তমানে তৃণমূল চালিত পুরবোর্ড কেউ বিগত ৫ বছরে এর উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়নি।

উত্তর কলকাতার খালপাড়ে বসবাসকারী মানুষদের বিশ্বব্যাঙ্ক এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের নির্দেশে উপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা না করে অত্যন্ত অমানবিকভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু মূল নিকাশি নদী বিদ্যাধরী ও বাগজোলা খাল সংস্কার না হওয়ার ফলে কাজের কাজ কিছু হয়নি। গরিব অসহায় মানুষগুলোকে উচ্ছেদ করাই সার হয়েছে।

এমতাবস্থায় কলকাতার নাগরিকরা বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের কার্যকলাপে চূড়ান্তভাবে হতাশ। চার বছর ধরে নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যর্থতা এক বছর পুরবাজেটে কর ছাড় দিয়ে ঢাকা যাবে না। এর সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যেখানে অর্থের অভাবের অজুহাতে বহু পৌরনাগরিক পরিষেবা আটকে আছে, সেখানে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করতে না পারাটা পুরসভার কৃতিত্ব না ব্যর্থতার পরিচয়, তা মেয়রই বলতে পারেন।

তবে পুরসভার এই অপদার্থতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় মানুষ সংগঠিত হচ্ছেন, সোচ্চার হচ্ছেন পৌরসমস্যা সমাধানের দাবিতে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে জল নিকাশি ও খালসংস্কার কমিটি। হাজার হাজার নাগরিকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সেচমন্ত্রী ও মেয়রের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এই আন্দোলনে নাগরিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গণআন্দোলনের অন্যতম শক্তি এস ইউ সি আই দল।

কলকাতা পুরসভা সংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

১। বছরে ৩০ লক্ষ ঘনফুট পাঁক তুলে ফেলতে পারলে কলকাতার রাস্তায় জমা জল কমবেশি ১ ঘণ্টায় কমে যাবে।
কিন্তু ১৯৮৮-৮৯ থেকে বছরে পাঁক তোলা হচ্ছে প্রায় ৬ লক্ষ ঘনফুট — প্রয়োজনের মাত্র এক পঞ্চমাংশ।

২। পুরসভার মতে ঘণ্টায় মাত্র এক-চতুর্থাংশ ইঞ্চি বা তার বেশি বৃষ্টি হলে কলকাতা ভাসবেই। গত ১৯৯৯ আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বর্ষা থামার পর মোমিনপুর, বেহালা, গার্ডেনরিচ, তারাতলা ও কাশীপুর থেকে জমা জল পুরোপুরি সরতে সময় লেগেছে ১০ থেকে ২৫ দিন।

৩। ২৪-২৭ সেপ্টেম্বর '৯৯ কলকাতা যখন বানভাসী তখন সব মিলিয়ে ৯৪টি পাম্পের অর্ধেকের কম কাজ করেছে।
১৭টি পাম্পিং স্টেশনের মোট পাম্পের ৪১টি কাজ করেছে। ৫৩টি বন্ধ ছিল যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য।

৪। কলকাতায় প্রায় ৬৫,০০০ — ১,০০,০০০ গালিপিট আছে। কিন্তু উপযুক্ত শ্রমিকের অভাবে (আগে শিশুশ্রমিক দিয়ে পরিষ্কার করা হত) বর্তমানে তা পরিষ্কার হয় না।

৫। মৌলালি থেকে পামারবাজার পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ ১ কিলোমিটার লম্বা নিকাশি নালা ১০০ বছর আগে ইঁট দিয়ে বানানো হয়েছিল, বয়সের ভারে তা ভেঙে পড়েছে।

(সূত্র ঃ বিপন্ন পরিবেশ ২০০০)

কল্যাণ সিংয়ের বয়ান

একের পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ ৬ ডিসেম্বর দিনটিতে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই পাকিস্তানি চর হয়ে গিয়েছিলেন এবং মসজিদ ধ্বংস করার জন্য 'অনুপ্রবেশকারীদের' প্ররোচিত করেছিলেন।

এরপরেও একটা ছোট প্রশ্ন থাকে। কল্যাণ সিংয়ের বয়ানই যদি সত্য হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কেন তিনি ঐ স্থানে সমবেত 'অনুপ্রবেশকারী'দের ছত্রভঙ্গ করতে ও তাদের ওপর গুলি চালাবার আদেশ দিতে অস্বীকার করেছিলেন? ঘটনাস্থল থেকে তিন কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে ফৈজাবাদে বিশাল আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, কারণ ঐ সময় দলে দলে 'করসেবকরা' ঐস্থানে জড়ো হচ্ছিল। কী উদ্দেশ্যে তারা জড়ো হচ্ছিল কল্যাণ সিং-এর চমকপ্রদ ঘোষণার আগে তা কেউ জানত না। ঐ দিন সকালে করসেবকরা যখন গাঁইতি-বেলচা নিয়ে বাবরি মসজিদের উপর চড়াও হল, তখন কল্যাণ সিং পুলিশবাহিনীকে নির্দেশ দেন, যেন করসেবকদের উপর কোন বলপ্রয়োগ করা না হয় এবং করসেবকরা যা করতে চায় তাতেই যেন সায় দেওয়া হয়। সুতরাং বলতেই হয় যে, করসেবকরা যদি 'অনুপ্রবেশকারী' হয়ে থাকে, তাহলে কল্যাণ সিংও তাই।

কল্যাণ সিং সহ বিজেপি'র অন্য নেতারা, যাঁরা বাবরি মসজিদ ধ্বংসে নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরা লিবেরহান কমিশনের কাছে বহুবার মিথ্যা বলেছেন এবং নিজেদের বলা কাহিনীও বারবার বদল করেছেন। বোঝাই যায়, এসব তাঁরা করেছেন নিজেদের বাঁচাবার জন্য, কিন্তু তাঁদের একথা ভাবা ঠিক নয় যে, তাঁরাই কেবল বুদ্ধিমান, অন্য সবাই নির্বোধ।

কল্যাণ সিংকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, সেসময় তিনিই আর এস এস-বিজেপি কর্মীদের দ্বারা ''হিন্দু হৃদয়ের সম্রাট'' হিসাবে ভূষিত হয়ে অত্যন্ত গর্বিত বোধ করেছিলেন। এই ধ্বংসকাণ্ডে তাঁর অপর একটি ভূমিকাও ছিল। অটল বিহারী বাজপেয়ি কার্যত তাঁর (কল্যাণ সিংয়ের) পৃষ্ঠপোষকতাতেই প্রধানমন্ত্রী পদে বসতে পেরেছেন, একথা বলে তিনি বাজপেয়িকে রুষ্ট করেছিলেন। বাজপেয়ি তার জবাব দেন বিজেপি থেকে কল্যাণ সিং-কে বহিষ্কার করে। দলের বাইরে থাকার সময় কল্যাণ সিং বারবার বিজেপি এবং আর এস এস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার জন্য ওরা ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা করেছিল এবং সে ব্যাপারে কল্যাণ সিংকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই তা কার্যকর করা হয়েছিল। আজ পুনরায় দলে যোগ দেওয়ার পর তিনি নিজেকে ও সহকর্মীদের রক্ষা করার জন্য আবার সুর বদলেছেন। এমন একজন ব্যক্তিকে কি বিশ্বাস করা যায়?

(দি স্টেটসম্যান ৪-৭-০৪)

জঙ্গিপুর হাসপাতাল ঃ পথ্য চার্জ চালু করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীর পথ্যের উপর চার্জ নেওয়া শুরু করার প্রতিবাদে ২ জুলাই 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং হাসপাতাল সুপারের নিকট ডেপুটেশন দেয়। পথ্যের চার্জ প্রত্যাহার, হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, জীবনদায়ী ওষুধ ও জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন সরবরাহ, অর্থোপেডিক ডাক্তার ও অ্যানাসথেটিস্ট নিয়োগ, সমস্ত প্রকার অপারেশনের ব্যবস্থা, শিশু বিভাগে আই সি ইউ খোলা, হাসপাতালের মধ্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মীরজা নাসিরুদ্দিন ও অনুরাধা মণ্ডল। আন্দোলনের চাপে সুপার বলেন, পথ্যে চার্জ বসছে না। তিনি অন্যান্য দাবিগুলিও পূরণের আশ্বাস দেন।

মুর্শিদাবাদে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অবস্থান ডেপুটেশন

বিদ্যুতের ক্রমাগত মাশুলবৃদ্ধি, দিনের পর দিন পরিষেবার বেহাল দশা, বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে মানুষের মৃত্যু, ট্রাকভর্তি মূল্যবান পণ্য পুড়ে ধ্বংস হওয়া, লোডশেডিং, ভুতুড়ে বিল, ঘুষের অন্যায় জুলুম, ট্রান্সফর্মারের অভাবে মাঠের ফসল নষ্ট ইত্যাদি নানাবিধ কারণে অত্যাচারিত মানুষ প্রতিকার চাইতে সমবেত হয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর ডি-ই(আই) অফিসের সামনে। গত ৭ জুলাই বুধবার বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সর্বস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র সংগঠন ''সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি'র মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির আহ্বানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রুপ সাপ্লাই-এর অধীনস্থ বিদ্যুৎ গ্রাহকরা বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হয়েছিলেন। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সমিতির লালগোলা শাখার সম্পাদক বাপী ঘোষ, জলঙ্গী শাখার সভাপতি সমরেন্দ্র কুমার ভৌমিক। ভগবানগোলা শাখার সভাপতি মেকাইল হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বক্তব্য রাখছেন সঞ্জিত বিশ্বাস

জেলা সম্পাদক কুনাল বিশ্বাস-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ডি-ই(আই)এর কাছে দাবি সনদ পেশ করেন। ডি-ই(আই) দাবিগুলির সাথে সহমত প্রকাশ করে, সহানুভূতির সাথে বিবেচনার আশ্বাস দেন। প্রায় দুই শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহকদের এই অবস্থানে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত বহু দাবির কথা উল্লেখ করেন এবং অপূরিত দাবিগুলি আদায়ের জন্য আরও বৃহত্তর আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বুদ্ধবাবুর শান্তির মরূদ্যানে নারীরা বিপন্ন

মুম্বাইয়ের পতিতাপল্লির নরক থেকে কোনক্রমে পালিয়ে এসেছেন রায়গঞ্জের মেহেন্দি গ্রামের গৃহবধূ প্রমীলা বর্মন। স্বামী পরিত্যক্তা এই মহিলা রাজমিস্ত্রির যোগানদারের কাজ করে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাতেন। বাইরে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামেরই কয়েকজন ছেলে তাকে মুম্বাই নিয়ে যায় এবং শেষে বিক্রি করে দেয়। এরা যে নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত প্রমীলা দেবী বুঝতে পারেননি। শুধু প্রমীলাদেবীই নন, দশ মাইলের দামকু বর্মন, ঝিটকিয়ার অম্বিকা দেবশর্মা এবং খলসিগ্রামের মোফিলা কোড়ীরা এভাবেই বিক্রি হয়ে যান। রায়গঞ্জ সহ উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নারী ও শিশু পাচার চক্র অত্যন্ত সক্রিয়। রায়গঞ্জ শহরের মেয়েরা, গৃহবধূরা ইভটিজারদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ। সম্প্রতি ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হন স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন্দ্রনাথ করের পুত্র পুলক কর। বুদ্ধবাবুর শান্তির মরূদ্যানে নারীরা বিপন্ন, খুন হয় প্রতিবাদী।

মুম্বাইয়ের অন্ধকার জগত থেকে পালিয়ে এসে প্রমীলাদেবী রায়গঞ্জ থানায় গিয়ে সব কথা বিস্তারিতভাবে জানাতে চান। কিন্তু পুলিশ কোন অভিযোগ জমা নিতে রাজি হয়নি। 'ডু ইট নাও' শ্লোগানের প্রবক্তা বুদ্ধবাবুর পুলিশকে নড়েচড়ে বসাতে রাস্তায় নামতে হয় এস ইউ সি আই কর্মীদের। ১ জুলাই ডি-এম এবং এস-পি'র নিকট গণবিক্ষোভ-ডেপুটেশন দিয়ে, অপর তিনজন মহিলাকে উদ্ধার করে আনার দাবি জানানো হয়। আন্দোলনের চাপে অতিদ্রুত এক বিশেষ পুলিশী দল পাঠানো হবে বলে এস পি জানাতে বাধ্য হন। তিনি তদন্তের জন্য মহিলা সেলও গঠন করেন। পাচারচক্রের পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানানো হয় এস ইউ সি আই-এর গণসংগঠন ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এস এবং খলসী গ্রামের বাসিন্দাদের সংগ্রামী গণমঞ্চের পক্ষ থেকে।

সেচমন্ত্রীর কাছে মেদিনীপুর জেলায় বন্যা, খরা ও ভাঙন প্রতিরোধে ডেপুটেশন

মেদিনীপুর জেলায় বন্যা, খরা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির এক প্রতিনিধি দল ৬ জুলাই রাজ্য সেচমন্ত্রী গণেশ মণ্ডলের কাছে ডেপুটেশন দেন। প্রতিনিধিরা ৮ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। দাবিগুলি হল — ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান পুনর্মূল্যায়ণ করে কার্যকর করা এবং পলাশপাই খাল অবিলম্বে সংস্কার করা, এগরার দুবদা বেসিন স্কীম কার্যকর করা, চম্পাখাল সংস্কার করা, কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাগুই নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্কীম রূপায়ণ, কোলাঘাট-তমলুক উত্তরচড়া, দক্ষিণচড়া-মহিষাদলের অমৃতবেড়িয়া-দনিপুর, ইচ্ছাপুর-মায়াচর প্রভৃতি স্থানে রূপনারায়ণ নদীর ভাঙন এবং হলদিয়া ও নন্দীগ্রামে হলদি ও হুগলি নদীর ভাঙন, বেলদা ও দাঁতন এলাকায় সুবর্ণরেখার ভাঙন রোধে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া, কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই-এ মজে যাওয়া দেনান ও মেচেদা-বাঁপুর খাল খনন করে দেনান-দেহাটি জলনিকাশি প্রকল্পের রূপায়ণ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও নিকাশি খালগুলিকে সংস্কার করা। ডেপুটেশনে মন্ত্রী ছাড়াও মুখ্য বাস্তুকার-২ উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী প্রতিনিধিদের বলেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ও পুনর্মূল্যায়ণের কথা ভাববেন। নিকাশিখাল সংস্কারের ব্যাপারে ৮ জুলাই চিফ ইঞ্জিনিয়ার ঘাটালের সেচ বিভাগের এস ই ই ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। সরকারের আর্থিক সঙ্কটের জন্য অন্যান্য দাবিগুলি আশু কার্যকর করা যাবেনা বলে মন্ত্রী জানান।

রাজ্য ও জেলা বন্যা, খরা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ডঃ শুভাশিস মাইতি, সতীশচন্দ্র পাল, মধুসূদন মান্না, ভবানীপ্রসাদ দাস, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অশোক মাইতি ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রতিনিধিরা বলেন, আন্দোলন ছাড়া এ সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করা সম্ভব নয়। তাই জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

কেন্দ্রীয় বাজেট

চারের পাতার পর

গরিব মানুষ ছিটেফোঁটা যাও পেত, তাও পাবে না। তাছাড়া এই সরকার ন্যূনতম কর্মসূচিতে গরিবের অনাহার-অপুষ্টি রুখতে গণবন্টন ব্যবস্থা, অর্থাৎ রেশন ব্যবস্থাকে জোরদার করার কথা বলেছে, অথচ যা দিয়ে রেশন চলে সেই ভরতুকিই যদি কমিয়ে দেওয়া হয় তবে রেশন প্রথা আরও ভেঙে পড়বে। এক্ষেত্রেও বর্তমান সরকার ন্যূনতম কর্মসূচিতে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

দ্বিতীয়ত, ভরতুকির জন্য বরাদ্দ ৫০ বা ৪৩ হাজার কোটি টাকাটা সাধারণ মানুষের কাছে বিরাট মনে হতে পারে। কিন্তু এটা সরকারের মোট খরচের তুলনায় খুবই সামান্য, কমবেশি মাত্র ৮ শতাংশ। অথচ জনস্বার্থে এই সামান্য অর্থ খরচ করতেও তারা নারাজ। কিন্তু প্রধানত মালিকশ্রেণীকে বিপুল ছাড় ও ভরতুকি দিতে গিয়ে সরকার যে ধার করছে তার সুদ বাবদ টাকায় ২৩ পয়সা, সামরিক খাতে টাকায় ১৪ পয়সা খরচ করতে তাদের আটকাচ্ছে না। এই সামরিক খাতে ব্যয়ও পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে বাজারকে কৃত্রিমভাবে তেজী রাখার জন্যই যে মূলত তারা করছে তা আমরা আগেই বলেছি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, অর্থাভাবটা যুক্তি নয়, অজুহাত। মালিকদের স্বার্থে তাদের অর্থের অভাব হচ্ছেনা, অভাব হচ্ছে শুধু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে। তাছাড়া সরকার নিজেই ক্রমাগত মালিকশ্রেণীকে ছাড় দিয়ে দিয়ে সরকারি আয় কমাচ্ছে শুধু নয়, প্রধানত বৃহৎ মালিকদের কাছ থেকে বকেয়া এক লক্ষ কোটি টাকা আদায় করার কার্যকরী ব্যবস্থাও কিছুই নিচ্ছে না। কালো টাকার পরিমাণ কত লক্ষ কোটি টাকা তা সরকার নির্ধারণই করে না, উদ্ধারও করে না। এছাড়া বিপুল কর পাওয়ার দু'টি উৎসে সরকার হাতই দেয় না। এক হল কৃষি, যার বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। কৃষি থেকে এদেশের কৃষি পুঁজিপতিদের বিশাল আয়, অথচ এক পয়সাও তাদের আয়কর নেই। দ্বিতীয় হল, ইদানীংকালে সবচেয়ে রমরমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবসা, যার প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুও পঞ্চমুখ। ফ্রি ট্রেড জোন বা আই টি পার্কে অবস্থিত তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির বিপুল অঙ্কের লাভ পুরোপুরি করমুক্ত। এই লাভের ওপর কর বসালে এখান থেকেও বিপুল আয় হতে পারে। কিন্তু সে পথে এ সরকার যাবে না। এসব কথা এখন সিপিএমও তুলছে না। কারণ এরা সকলেই মালিকশ্রেণীর মদতে গদিতে বসেছে, এরা মালিকশ্রেণীর স্বার্থেরই রক্ষক।

নতুন সরকার ক্ষমতায় বসার পরই আমাদের দল বলেছিল, বিজেপি জোট ও কংগ্রেস জোট, দুই সরকারই হল সাধারণ মানুষের কাছে মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। সিপিএম সংকীর্ণ গদির স্বার্থে কংগ্রেস জোট সরকারকে 'জনমুখী', 'জনকল্যাণে আন্তরিক' বলে নির্লজ্জের মতো স্তাবকতা করলেও এই সরকারও জনবিরোধী, মালিকস্বার্থের সেবক, এদের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির মনভোলানো কথাগুলি নেহাতই লোকঠকানো বুলি। বাজেট আমাদের সেই বিশ্লেষণকেই সত্য প্রমাণ করেছে।

চাষীর সমস্যার সমাধান হবে না

তিনের পাতার পর

তারা পাট কিনবে সর্বনিম্ন দামে এবং পাটজাত দ্রব্য বিক্রি করবে সর্বোচ্চ দামে। ঠকবে গরিব চাষীরা। কিছু কিছু মধ্যচাষী হয়তো কিছুদিন পাট ঘরে রেখে দাম কিছুটা বাড়লে বিক্রি করতে পারবে, কিন্তু গরিব চাষীদের বিক্রি না করলে চলবেনা।

সরকার কৃষকদের শুধু যে মজুতদার-আড়তদার-বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং বহুজাতিক পুঁজির মালিকদের শোষণের মধ্যে *ঠেলে* দিয়ে নীরব দর্শক হয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন রকম পঞ্চায়েতী ট্যাক্স জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। হাঁস-মুরগী, গবাদি পশু, সাইকেল, ভ্যান-রিক্সা-গরুর গাড়ি, শ্মশান, সর্বত্রই ট্যাক্স বসাচ্ছে। এছাড়া শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি করে সমস্যা আরও বাড়ানো হয়েছে।

ফলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ঘোষণা অনুযায়ী বছরে ১০০ দিন কাজের ব্যবস্থা আইনসিদ্ধ করা, ন্যূনতম মজুরী পাওয়ার ব্যবস্থা করা, বিপিএল তালিকা সম্পূর্ণ করা, পঞ্চায়েতী প্রকল্পগুলিতে অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি, পঞ্চায়েতী ট্যাক্স না চাপানো প্রভৃতি দাবিতে অবিলম্বে শক্তিশালী কৃষক ও খেতমজুর আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরী প্রয়োজন। সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটি এই সমস্ত সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী সমীপে ডেপুটেশন দিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নেমেছে। যদি সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করাতে হয়, তাহলে গণস্বাক্ষর অভিযান দিয়ে এই যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, তাকে ধাপে ধাপে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য রাজ্যের সমস্ত খেতমজুর, গরিব চাষী, মধ্যচাষীকে অবিলম্বে এগিয়ে এসে এলাকায় এলাকায় আন্দোলনের গণকমিটি গঠন করে তার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। এছাড়া বাঁচার দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই।

মহারাষ্ট্রে শিশুমৃত্যু

মানুষের জীবনের কতটুকু মূল্য দেয় এই রাষ্ট্র?

মহারাষ্ট্র রাজ্যে সরকারের প্রকাশিত সাম্প্রতিক কিছু তথ্য সাধারণ মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ২০০৩ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৪-এর মে মাস পর্যন্ত সে রাজ্যের ১৫টি জেলার উপজাতি সম্প্রদায়ের ৯০০০-এর বেশি শিশু অপুষ্টিতে ভুগে মারা গেছে। শুধুমাত্র গত বছরের এপ্রিল থেকে এ বছরের মার্চের মধ্যেই মারা গেছে আরো ১০০০টি শিশু। এই মর্মান্তিক তথ্যের আঘাত লঘু করতেই বোধহয় স্বাস্থ্যদপ্তরের অপর এক প্রবীণ অফিসার জানিয়েছেন, অপুষ্টিতে মৃত এই শিশুদের সংখ্যা মোট উপজাতি শিশুদের মাত্র ২ শতাংশ। ২০০২-এর সেপ্টেম্বরে পুণের একটি এন জি ও অপুষ্টিজনিত রোগে উপজাতি শিশুদের মৃত্যুর খবরটি প্রকাশ করে। তবে, এর আগেও নানা মহল থেকে মহারাষ্ট্রের উপজাতি পরিবারের শিশুদের স্বাস্থ্যের মর্মান্তিক অবস্থা সম্বন্ধে বারবার নানা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। শুধুই কি উপজাতিভুক্ত শিশুদেরই এই দুরবস্থা? তা নয়। এদেশের শিশুদের একটা বড় অংশ যে অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায় — এ কথা আজ আর গোপন নেই। ১৯৯২-৯৩ সালে প্রকাশিত প্রথম জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষায় (National Family Health Survey) দেখানো হয়েছে যে, পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার, ভারত তাদের অন্যতম। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দুর্ভিক্ষের জন্য কুখ্যাত সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন আফ্রিকার কয়েকটি দেশের অপুষ্টি স্তরের দ্বিগুণ অপুষ্টি স্তরে পড়ে রয়েছে ভারতবর্ষের কিছু কিছু অঞ্চল। অথচ, এদেশে মজুত করা খাদ্যের পরিমাণ মোটেই কম নয়।

মহারাষ্ট্রে ২০০২ সালে অপুষ্টিজনিত কারণে কেন মানুষকে মরতে হল তার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে বেসরকারি সমীক্ষক দল দেখেছে, এদের অভাব ও গরিবি এত চরম যে, রেশন দোকান থেকে চাল-গম কেনার মত টাকাও এদের নেই। থানে জেলায় ৬ মাস ধরে রেশন দোকানগুলিতে খাদ্যশস্যের পাহাড় জমে থাকছে। সেই খাদ্যশস্য কেনার ক্ষমতা যাদের নেই, অপুষ্টিতে ভুগে মরছে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই। এসব অঞ্চলে 'এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম' কাজ করেনি। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য খাদ্য সরবরাহের যে সরকারি ব্যবস্থা ছিল, তার ২৫% টাকা আত্মসাৎ করেছে সরকারি আমলা আর দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকরা। এদিকে মহারাষ্ট্র সরকার শিশুদের মর্মান্তিক মৃত্যুরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ঠিক না ভুল তা নিয়ে তর্ক জুড়েছে, ঠিক যেমন এ রাজ্যে মন্ত্রীরা তর্ক তুলেছেন আমলাশোলে মৃত্যুর কারণ নিয়ে। কী অদ্ভুত মিল মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস জোট সরকারের মন্ত্রীদের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম জোট সরকারের মন্ত্রীদের! মহারাষ্ট্র সরকার যতই তর্জন গর্জন করুক, তাদের নিদারুণ অবহেলার জন্যই যে এভাবে গরিব ঘরের শিশুদের মরতে হচ্ছে, এ সত্য দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ। গরিবদের খাবার যোগানোর জন্য কত সুন্দর সুন্দর নামের প্রকল্প আছে, অথচ গরিব মানুষ তা পায়না। বছর বছর ভোট হয়, গদিতে এক দল গিয়ে অন্য দল আসে, জীবন্ত গণতন্ত্রের নামে কত জয়ধ্বনি হয়, কিন্তু গরিবের অনাহার দূর হয়না, গরিবি কাটেনা। বোঝা যায়, মূল গলদটা রয়েছে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই, যার বদল শুধু সরকার বদলের দ্বারা ঘটতে পারেনা।

(তথ্যসূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ৮-৭-০৪)

রেলবাজেট

দুর্নীতি রোধ ও যাত্রীনিরাপত্তায় কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি

একের পাতার পর

খরচ ১৫ থেকে ২০ শতাংশ মাত্র (দ্রঃ ইকনমিক টাইমস ৭-৭-০৪)। তৎসত্ত্বেও রেলের ভাড়া ইতিমধ্যেই খুব বেশি। রেলে পা দিলেই পাঁচ টাকা ভাড়া, তারপরই লাফ দিয়ে সাত টাকা। সমদূরত্বে বাস, অটোর ভাড়া এর চেয়ে কম। দূরপাল্লার নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত যাত্রীদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাতের যাত্রায় স্লিপারের জন্য আগে কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীভাড়ার সঙ্গে স্লিপার ভাড়া যোগ হতো। ২০০২-০৩ সালে স্লিপার ক্লাসকে আলাদা শ্রেণী করা হয়েছে এবং স্লিপার ক্লাসে যাত্রীভাড়া দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে স্লিপার ভাড়া যুক্ত করে রাতের যাত্রায় ভাড়া যা দাঁড়িয়েছে, তা সমদূরত্বের দূরপাল্লা বাসের সমতুল। ফলে সমস্ত রাজ্যেই বাস পরিবহন রেলের বিকল্প হিসাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। রেলের উচ্চশ্রেণীর যাত্রীভাড়ার সঙ্গে বিমানভাড়ার পার্থক্যও ক্রমেই কমে আসছে। রেলবোর্ডের চেয়ারম্যান আর কে সিং বলেছেন, ২০০২-০৩ সালে বিপুল ভাড়া বাড়ানোর পর যাত্রীসংখ্যা ৩.৮ শতাংশ কমে গিয়েছিল। আয় বাড়াবার জন্য বারবার পণ্য মাশুল বাড়ানোয় রেলের পণ্য পরিবহন ব্যবসাও কমছিল, সেই ব্যবসা ধরে নিচ্ছিল সড়ক পরিবহন, অর্থাৎ ট্রাক ব্যবসায়ীরা (দি টেলিগ্রাফ, ৭-৭-০৪)। এই অবস্থায় যাত্রীভাড়া বা পণ্য মাশুল বাড়ালে যাত্রী বা পণ্য পরিবহনের ব্যবসা রেল আরও খোয়াতো, রেলের আয়ও তত বাড়ত না। তাহলে বাজেট পেশের সময় নতুন রেলমন্ত্রীর সামনে যাত্রীভাড়া ও পণ্যমাশুল বাড়ালে আয় কমার বাস্তব আশঙ্কা ছিল। ফলে যাত্রীস্বার্থেই ভাড়া বাড়ানো হয়নি, একথা পুরো সত্য নয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা বলেছি, ভাড়া বাড়ানো দূরের কথা সরকার চাইলে ভাড়া কমাতে পারত। কী করে কমানো যেত?

১। ৮৭৩ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট না করে না-লাভ না-ক্ষতির বাজেট করলেই যাত্রীভাড়া কমানো যেতো।

২। এছাড়া রেল কেন্দ্রীয় সরকারকে বর্তমান বছরের ডিভিডেন্ড বাবদ ৩৩০৫ কোটি টাকা ও বকেয়া ডিভিডেন্ড বাবদ ৩০০ কোটি টাকা, মোট ৩৬০৫ কোটি টাকা দিয়েছে। এভাবে ডিভিডেন্ড না দিলেও চলত, অতীতে তেমন নজির আছে। কাজেই এভাবে টাকা ও ডিভিডেন্ডের টাকা যাত্রীস্বার্থে ব্যয় করে দুই খাত মিলে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ যাত্রীভাড়ার প্রায় ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া যেত।

যাত্রীভাড়া কমানোর এমন চমৎকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাত্রীভাড়া না কমিয়ে, অত্যধিক ভাড়া বহাল রাখাটা কী করে "জনমুখী" হয় সেকথা কেন্দ্রীয় সরকারের স্তাবকরাই বলতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যাত্রীভাড়া কমানোর এই সুযোগ যে ছিল, সেটা ঘুণাক্ষরেও সরকার বিরোধীরা, সংবাদপত্রমহল, এমনকি সিপিএমও তুলছে না। কারণ এরা সকলেই রেলকে পরিষেবা হিসাবে নয়, ব্যবসা হিসাবে দেখে। ফলে এরা সাধারণভাবে সর্বদাই ভাড়াবৃদ্ধির পক্ষে।

রেলের দুর্নীতির কথা তো কহতব্য নয়। কত হাজার কোটি টাকা যে রেলে দুর্নীতিতে বেরিয়ে যায় তার কোন হিসাব নেই। রেলের টিকিট চেকিং, বুকিংয়ের কাজ থেকে উচ্চস্তরের আমলা পর্যন্ত দুর্নীতি সীমাহীন। একটা কথা দীর্ঘদিন চালু আছে যে, চুরি না হলে রেললাইন সোনা দিয়ে বাঁধানো যেত। কথাটা খুব মিথ্যে নয়। অথচ সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে রেলমন্ত্রীর একটা কথাও নেই। কারণ, সেই দুর্নীতি রুখবে কে? যে সরকারের মন্ত্রীরাই দুর্নীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, তারা কী করে দুর্নীতি রুখবে? আর এই সরকারকেই জনপ্রিয় করবার ঠিকাদারি নিচ্ছে সিপিএম। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে!

আর যাত্রী নিরাপত্তা? এ ব্যাপারে যত কম বলা যায় ততই ভাল। জীবন হাতে নিয়ে যাত্রীদের রেলে যাতায়াত করতে হয়। রেল ডাকাতি আর দুর্ঘটনা প্রায় নিত্য ঘটনা। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, এ ব্যাপারে কারোর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, দুঃখ নেই, লজ্জাও নেই। যাত্রী নিরাপত্তার প্রশ্নে বহু কাজ হয়নি, হওয়ার কোন উদ্যোগও নেই। রেলের শতবর্ষের পুরনো জরাজীর্ণ সেতু সংস্কার, প্রহরাহীন লেভেল ক্রশিংয়ে প্রহরী নিয়োগ, লাইন মেরামত ও সংরক্ষণ, লাইনের সম্প্রসারণ প্রভৃতি যা না করলেই নয় সেইসব ন্যূনতম অত্যাবশ্যক কাজও কিছুই হচ্ছে না। ইঞ্জিনে কলিশনরোধী অত্যাধুনিক যন্ত্র লাগানোর কথা দীর্ঘদিন ধরেই শোনানো হচ্ছে, তাও করা হয়নি। এবারের বাজেটেও সেই পুরনো রেকর্ড বাজানো হয়েছে। অথচ নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ২০০৩-০৪ সালে প্রতিটি টিকিটে বাড়তি সেস বসিয়ে যাত্রীদের ঘাড় ভেঙে সরকার তুলছে ১৭০০০ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাঁরা যাবেন, রেলে তাঁদের বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা দেখানো হচ্ছে, যেন বেকারদের কথাও এ সরকার ভাবছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন্দ্রীয় সরকারে নতুন নিয়োগই যখন নেই, বরং ব্যাপকহারে ছাঁটাইয়ের খড়্গ যেখানে ঝুলছে সেখানে নতুন চাকরির ইন্টারভিউ পাবে ক'জন? মুষ্টিমেয় চাকরির জন্য লক্ষ লক্ষ বেকারকে রেলে ভাড়া দিয়েই চাকরির পরীক্ষায় বসার জন্য যেতে হবে, তারপর প্যানেল থেকে যে মুষ্টিমেয় যুবক ইন্টারভিউ পাবে তাদের টিকিট ছাড় দিয়ে বেকারদরদী সেজেছেন রেলমন্ত্রী। মৃত সৈনিকদের বিধবাদের জন্য বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূলত সমাজের নীচুস্তরের অত্যন্ত গরিব, খেটে খাওয়া নিত্যযাত্রী দিনমজুরদের জন্য স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিটের ব্যবস্থা আইনত চালু থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক জটিলতা ও প্রশাসনের গরিববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সে টিকিট পেতে গরিব মানুষের যে হয়রানির একশেষ হচ্ছে, নিত্য অপমান ও কটূক্তির মুখে পড়তে হচ্ছে, তাকে নিয়মানুগ ও সহজ করার সামান্য কাজটাও রেলমন্ত্রী করেননি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভাড়ার প্রশ্নে যাত্রীস্বার্থ রক্ষা করা, যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা — এর কোনটাই রেলবাজেটের লক্ষ্য নয়। তাহলে রেলমন্ত্রীর বাজেটের মূল লক্ষ্য কী?

তাঁর আশু লক্ষ্য হল, বিহার রাজ্যের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ফয়দা তোলা এবং এ ব্যাপারে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী রামবিলাস পাসোয়ান এবং নীতীশ কুমারকে পিছনে ফেলে নিজেকে আরও জনপ্রিয় এবং বিহার-স্বার্থের চ্যাম্পিয়ন প্রতিপন্ন করা। এজন্য বিহার নির্বাচনকে সামনে রেখে রেলমন্ত্রী বিহারের জন্য অনেকগুলি ট্রেন ও প্রকল্প ঘোষণা করেছেন এবং নিজের কেন্দ্র ছাপরায় একটি চাকা তৈরির কারখানা করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। স্মরণে থাকতে পারে, রেলমন্ত্রী হিসাবে নীতীশ কুমারও নিছক নিজস্ব সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশজোড়া প্রবল জনপ্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র হাজিপুরে রেলের প্রধান দপ্তর তৈরির জন্য পূর্ব রেলকে দু'ভাগ করেছিলেন। এতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় ছাড়া কাজের উন্নতি কিছুই হয়নি। এক্ষেত্রে লালুপ্রসাদ ধূর্ততায় পূর্বসূরীদের টেক্কা দিয়েছেন। রেলের স্ক্র্যাপ বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন, এর দ্বারা রেলের স্ক্র্যাপ নিয়ে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও স্ক্র্যাপ মাফিয়াবাজি বন্ধ করাই তাঁর লক্ষ্য। রেলের দুর্নীতি তো কেবল স্ক্র্যাপ কেনাবেচাতেই সীমিত নয়, রেলের সর্বাঙ্গে দুর্নীতির দগদগে ঘা, যা নিয়ে রেলমন্ত্রীর কোন উদ্বেগের চিহ্ন বাজেটে নেই। এ থেকেই বোঝা যায়, রেলের স্ক্র্যাপ বিক্রি বন্ধের নির্দেশের দ্বারা দুর্নীতিরোধ করা তাঁর লক্ষ্য নয়, তাঁর লক্ষ্য স্ক্র্যাপ মাফিয়াদের দাপট খর্ব করার দ্বারা মাফিয়া মদতপুষ্ট রামবিলাস পাসোয়ান ও নীতীশকুমারের ক্ষমতা খর্ব করা এবং সেই মাফিয়াদের নিজ প্রভাবে নিয়ে আসা। এভাবে বিহার রাজনীতিতে প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ক্ষমতা খর্ব করা ও নিজের প্রভাব বাড়াবার চেষ্টার সাথে সাথে রেলে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, বিহারের জন্য নতুন ট্রেন ও নতুন প্রকল্প ঘোষণার দ্বারা তিনি বিহারের ভোটে ফয়দা তুলতে চান।

রেলমন্ত্রীর অপর লক্ষ্য হল — রেলবাজেটের মধ্য দিয়ে চালাকির রাস্তায় এটা দেখানো যে, এই সরকার আগের সরকারের মতো নয়। এ সরকার জনগণের কথা ভাবে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিবিরোধী প্রচারে জনস্বার্থরক্ষার যে গালভরা প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস জোট সরকার দিয়েছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে নতুন প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছিল, চালাকির রাস্তায় কিছু সস্তা জনমুখী কর্মসূচি নিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে এই সরকার কতটা সক্রিয় তা দেখিয়ে বাজেটের প্রকৃত জনবিরোধী চরিত্রকে আড়াল করাই হচ্ছে আসলে এর লক্ষ্য। সেই প্রতারণার কাজটা পাকা হাতেই করেছেন রেলমন্ত্রী। কার্যত এই জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও পরিচালিত হওয়ার জন্যই, রেলের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভাল থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ যা পেতে পারত, তা পায়নি।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

মন্ত্রী কেবল হাঁস-মুরগির ওপর করের কথা বলছেন কেন

রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র ৭ জুলাই বিধানসভায় বলেছেন, ''গরু, হাঁস, মুরগি, ছাগলের উপর কর বসানো হয়নি, বসছে না, বসবেও না'', কর বসানো নিয়ে ''বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন''। (আনন্দবাজার ৮-৭-০৪) সূর্যবাবু কি মনে করেন, বিরোধীরা বানিয়ে বানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কর বসানোর অভিযোগ এনেছে? কর বসানোর সার্কুলার তো রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরই পাঠাচ্ছে। ওই দপ্তরই তো অতি দ্রুত কর বসানোর কাজ শেষ না হলে শাস্তির ফরমান জারি করেছে। গরুর উপর বাৎসরিক ট্যাক্স ১৪৪ টাকা কারা ধার্য করেছিল? আজ জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখে তাঁরা গরু-হাঁস-মুরগি- ছাগলের উপর ট্যাক্স বসানো থেকে বিরত থাকার কথা ভাবছেন — সেটা আলাদা কথা। কিন্তু বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন কীভাবে? তাছাড়া শুধু কি হাঁস মুরগি ছাগলের উপর ট্যাক্স বসছে? বাইসাইকেলে ট্যাক্স ধার্য হয়েছে বছরে ৫ টাকা, রিক্সা-ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, গরু-মহিষ-ঘোড়ার গাড়িতে ২ টাকা, ট্রাক্টরে ১৫০ টাকা, ধানকল-বরফকল-চালকলে ২৫০ টাকা, টেলিফোন বুথ, জেরক্স সেন্টারে ১০০ টাকা, শ্মশানে, গোরস্থানে ৫০ টাকা, কৃষি জমির মিউটেশনে একর প্রতি ১০০ টাকা, অ-কৃষি জমির মিউটেশনে একর প্রতি ২০০ টাকা, অ-বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণী পরিবর্তনে একর প্রতি ১০০০ টাকা, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণী পরিবর্তনে একর প্রতি ২০০০ টাকা, এবং বাণিজ্যিক ফসলের জন্য ব্যবহৃত জমির খাজনা ও সেস বাবদ একর প্রতি ৭৪৪ টাকা কর ধার্য করা হয়েছে। পঞ্চায়েতে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে কর বসানোর ষড়যন্ত্র চলছে। এর মধ্য থেকে হাঁস-মুরগির মতো ছোটখাটো দুই একটা বিষয় কর থেকে বাদ দিয়ে তাঁরা বলতে চাইছেন, ''বিরোধীরা অযথা করবৃদ্ধির সোরগোল তুলছে।'' একথা বলে করবৃদ্ধির বিরাট ষড়যন্ত্রকে তাঁরা আড়াল করছেন এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন।

লোকসভা নির্বাচনের আগে সূর্যবাবুরা বলেছিলেন, পঞ্চায়েতে ট্যাক্স বসানো হবে না। কিন্তু নির্বাচনের পরেই ট্যাক্স বসানো নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন ওই বিজেপির মত। বিজেপি ভোটের আগে বলেছিল পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হবে না। জিতলে তারাও বাড়াতো, যেমন করে কংগ্রেস সরকার বাড়াল। সিপিএমের রাজনীতি আজ এই ধাঁচের, মিথ্যা এবং প্রতারণায় পূর্ণ।

সূর্যবাবু স্বীকার করেছেন, 'পঞ্চায়েতে আয় ও সম্পদ বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একটি 'মডেল ড্রাফট' তৈরির কাজে হাত দিয়েছে।'' (আনন্দবাজার, বর্তমান, ৮-৭-০৪) এই আয় যে গরিব মানুষদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে করা হচ্ছে তা আর গোপন থাকছে কোথায়? সূর্যবাবুরা বলছেন, ট্যাক্সবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ১৯৭৩ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারই নিয়েছিল। তাঁরা নতুন কোন নীতি নিচ্ছেন না, কংগ্রেসী নীতিই অনুসরণ করছেন। তাহলে কংগ্রেসের সাথে তাদের পার্থক্য কোথায়? নাকি, কংগ্রেসের কাজটা আরও দক্ষতার সাথে করার জন্যই তারা ক্ষমতায় গিয়েছেন ? পরিষ্কার করে সেকথা বললেই হয়। এই জন্যই কি জনসাধারণ তাদের সমর্থন করেছিল? তারাও কি পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের নীতি অনুসরণ করার কথা বলেই জনসাধারণের সমর্থন চেয়েছিলেন ?

তাঁরা বলছেন, রাজ্য সরকারের অর্থসংকটের জন্যই নাকি পঞ্চায়েতে ট্যাক্স বসানো। যেন জনগণের অর্থসঙ্কট নেই। তাছাড়া কথাটা কি সত্য? আসলে অর্থসঙ্কটের কথা বলাটা সরকারের কাছে ট্যাক্সবৃদ্ধির একটা বড় অজুহাত নয় কি? কারণ সম্প্রতি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কর্তারাই প্রকাশ্যে বলেছেন, বিভিন্ন রকম কর বসানোর পেছনে রাজ্য সরকারের আর্থিক সঙ্কটের কোন সম্পর্ক নেই, ব্রিটিশ সংস্থা ডি এফ আই ডি'র চাপেই করবৃদ্ধি করতে হচ্ছে। (বর্তমান ৫-৭-০৪)

তাহলে এই কথা তাঁরা লুকোচ্ছেন কেন? বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার সময় বুদ্ধবাবুরা বলে থাকেন, 'আমরা বিশ্বব্যাঙ্কের শর্ত মানি না, আমাদের শর্ত অনুযায়ী বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।' এটাও এক মিথ্যাচার। রাজ্যের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামপন্থী চেতনাসম্পন্ন মানুষেরা যাতে সিপিএম-এর সাম্রাজ্যবাদ ঘনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন না তোলেন সেজন্যই এরকম ফাঁকা গর্জন।

পঞ্চায়েতি ট্যাক্স যে ব্রিটিশ সংস্থা ডি এফ আই ডি'র (ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট) শর্ত মেনে বসানো হচ্ছে, পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তারাই তা বলছেন। এই সংস্থার কাছে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর হাজার কোটি টাকা সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাবটি বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিবেচনাধীন। তারা সাহায্য দেওয়ার আগে করবৃদ্ধির শর্ত দিয়েছে। বলছে, পঞ্চায়েতগুলিকে উন্নয়নের কাজে সরকারের উপর নির্ভরশীলতা কাটাতে হবে। আর তার একটাই রাস্তা — ট্যাক্সবৃদ্ধি, নতুন ট্যাক্স ধার্য করা — অর্থাৎ জনগণকেই শুষে নিংড়ে নেওয়া। পঞ্চায়েতে ট্যাক্স বসানোর পেছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার কালো হাত। আর তা আসছে সিপিএমের হাত ধরেই।

ডি এফ আই ডি যে আর্থিক 'সাহায্য' দিচ্ছে, নামে এটা সাহায্য হলেও আসলে তা ঋণ এবং সুদ সহ তা মেটাতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিভিন্ন দেশকে ঋণ দিয়ে, ঋণের জালে জড়িয়ে সে দেশে তার বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করে। ঋণের শর্ত হিসাবে তারা বলছে, সরকারি ভর্তুকি তুলে দাও, ব্যয় সংকোচ কর এবং সেজন্য প্রয়োজনে ছাঁটাই করতে হবে, বিদেশি পুঁজিকে জায়গা দিতে হবে, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ করতে হবে। এই সূত্র ধরেই ঢুকছে বিদেশি পুঁজি। দেশি-বিদেশি পুঁজির শোষণের মধ্যে জনগণকে আরও বেশি করে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

বামপন্থী কর্মী-সমর্থক এবং রাজ্যের পঞ্চায়েত সদস্যদের আজ ভেবে দেখতে হবে তাঁরা কি সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ডি এফ আই ডি'র শর্ত মেনে জনগণের উপর করের বোঝা বাড়াবেন, নাকি বামপন্থী ঐতিহ্য স্মরণ করে প্রতিবাদে সামিল হবেন? সিপিএমের বিরুদ্ধে একমাত্র তাঁরাই লড়তে পারেন বলে যারা অহরহ গলা ফাটাচ্ছেন, সেই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতও যদি সিপিএম-এর মতই গ্রামীণ মানুষের ঘাড়ে অতিরিক্ত কর বসানোর রাস্তাই নেয় তাহলে তাদের সিপিএম বিরোধিতাটা কিসের জন্য এবং কার স্বার্থে? জনগণকেও আজ ভেবে দেখতে হবে, তারা কি এই করবৃদ্ধির বোঝা বইবেন, নাকি সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ এবং এই ট্যাক্সবৃদ্ধি বয়কট করবেন? পঞ্চায়েত ট্যাক্সের নাম করে গ্রামীণ মানুষের ওপর সরকার নতুন করে ট্যাক্স চাপাতে পারবে কি পারবে না তা নির্ভর করছে জনগণের এই সংগঠিত আন্দোলনের উপর।

দিল্লিতে হুল দিবস পালিত

রাজধানী নয়াদিল্লির ''শহীদ ও মনীষী ইয়াদগার কমিটি'র উদ্যোগে ৪ জুলাই গোলমার্কেটে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণে ''হুলদিবস'' পালিত হয়। বিকাল ৪টায় অভ্যুত্থানের দুই প্রধান নেতা সিদু ও কানুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। সভার আহ্বায়ক ছিলেন ডাঃ জে এন মুর্মু।

সভার প্রধান বক্তা জে এল মণ্ডল বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সমকালীন দেশিয় শোষকদের বিরুদ্ধে সিদু-কানুর সংগ্রামকে শ্রেণীসংঘর্ষ হিসাবে দেখে এর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হবে। অন্যতম বক্তা ডাঃ ডি মারান্ডি বলেন, ব্রিটিশ না থাকলেও কালো চামড়ার শোষকরা আজও আছে। তাই তিনি দ্বিতীয় হুল-এর জন্য আবেদন জানান। অপর বক্তা পি কে শর্মা বর্তমান শোষণমূলক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হুল সম্পর্কে আলোচনা করেন। হুল-এর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্যামাপদ হেমব্রম।

সমাপ্তি ভাষণে প্রতাপ সামল কমিটির পক্ষ থেকে হুল-এর সার্ধশতবর্ষ পালনের জন্য প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

হুল দিবসে কলকাতায় মিছিল

ইরাকের পুতুল সরকারকে ভারতের কার্যত স্বীকৃতি দেওয়ার নিন্দায় এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১০ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা স্থাপিত ইরাকি সরকারকে মুম্বাই-এ কনসুলেট খুলতে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। এ হ'ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাক আক্রমণের এবং সে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে পদদলিত করে দখলদারি কায়েম রাখার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের গভীর আবেগকে নির্লজ্জভাবে উপেক্ষা করে মার্কিন তাঁবেদার ইরাকি সরকারকে কার্যত স্বীকৃতি দেওয়ার এক ধূর্ত কৌশলমাত্র। এর দ্বারা পরিষ্কার যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার যে নীতি কেন্দ্রের পূর্বতন বিজেপি জোট সরকার নিয়ে চলছিল, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও সেই একই পথে চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিঘেঁষা সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য করার জন্য শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

ফাঁসির দন্ডাদেশ সঠিকই হয়েছে — এম এস এস

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় ২৮ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

''১৮ বছরের স্কুলছাত্রী হেতাল পারেখকে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নামক এক যুবক যেভাবে ধর্ষণ ও খুন করেছে তা অত্যন্ত নৃশংস। যথেষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করেই তার ফাঁসির আদেশ হয়েছে। আমরা মনে করি, তার অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এই প্রাণদন্ডের আদেশ সঠিকই হয়েছে। এরাজ্যে ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর প্রমাণলোপের জন্য খুনের ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। রাজ্য সরকার ও তার পুলিশ-প্রশাসন এই ধরনের ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের ধরার জন্য এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় অপরাধীদের দুঃসাহস ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আমাদের সংগঠন ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য বরাবর দাবি জানিয়ে আসছে। অন্তত এই একটি ঘটনায় যথেষ্ট প্রমাণসহ ধনঞ্জয় যেভাবে ধৃত হয়েছে তাতে তাকে ধর্ষণকারী ও হত্যাকারী হিসাবে কর্তৃপক্ষ ফাঁসির আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছে। আমরা মনে করি, এই দন্ডাদেশ কার্যকরী হলে ভবিষ্যতে তা একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করবে এবং দেশে এ ধরনের অপরাধীদের সংযত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net